بنغـالي

সত্য পরিচয়

الحقيقة كما هي

মূল ঃ হুজ্জাতুল ইসলাম জাফর আল হাদী

অনুবাদ ঃ আবুল কাসেম



পরম করুণাময় ও দয়ালু মহান আল্লাহ্‌র নামে



قال رسول الله (ص):

"إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا ابداً، وانهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض"

মহানবী (সঃ) বলেছেনঃ 'আমি দু'টি ভারী ও মূল্যবান বস্তু তোমাদের মাঝে-রেখে যাচ্ছি। আল্লাহর কিতাব (কোরআন) ও আমার আহলে বাইত (রক্ত সম্পর্কীয় অতি নিকট আত্মীয়)। তোমরা যদি এ দু'টিকে আঁকড়ে ধর তবে কখনই বিপথগামী হবে না। এ দুইটি আমার সঙ্গে (কিয়ামতে) হাউসে কাউসারে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন হবে না।'

(সহীহ মুসলিম, খঃ ৭, পৃঃ ১২২; সুনানে দারেমী, খঃ ২, পৃঃ ৪৩২; মুসনাদে আহমাদ, খঃ ৩, পৃঃ ১৪, ১৭, ২৬, ৫৯; খঃ ৪, পৃঃ ৩৬৬, ৩৭১; খঃ ৫, পৃঃ ১৮২, ১৮৯; মুসতাদরাকে হাকেম, খঃ ৩, পৃঃ ১০৯, ১৪৮, ৫৩৩ দ্রষ্টব্য)

সত্য পরিচয়

সত্য পরিচয়

মূল ঃ হুজ্জাতুল ইসলাম জাফর আল হাদী
অনুবাদ ঃ আবুল কাসেম

আহলে বাইত (আলাইহিমুস সালাম) বিশ্বসংস্থা

আহলে বাইত (আঃ) বিশ্ব সংস্থার মুখবন্ধ

মহানবী (সঃ) ও তাঁর আহলে বাইতের (আঃ) রেখে যাওয়া উত্তরাধিকারটি তাদেরই প্রবর্তিত মতাদর্শে সংগৃহীত ও সঞ্চিত হয়েছিল এবং তাঁদের অনুসারীরা সেটিকে বিনাশ হতে রক্ষা করেছিল। এ মতাদর্শটিতে ইসলামের সকল শাখা ও বিভাগের সমন্বয় ঘটেছে। তাই এটি ইসলামের একটি সামগ্রিক রূপ। এ মতাদর্শ ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ও সত্যগ্রহণে প্রস্তুত অগণিত হৃদয়কে প্রশিক্ষিত করতে সক্ষম হয়েছিল যারা এর প্রবাহমান জ্ঞানের সুপেয় পানির ধারা হতে দু'হাত ভরে গ্রহণ করেছে। এটি সেই ধারা যা ইসলামী উম্মাহকে আহলে বাইতের (আঃ) পদাঙ্কানুসারী অনেক মহান মনীষী উপহার দিয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যখনই ইসলামী ভূখণ্ড ও তার বাইরের বিভিন্ন ধর্মমত ও চিন্তাধারার পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন ও নবচিন্তার উদ্ভব ঘটেছে তারা তার বলিষ্ঠ জবাব ও সমাধান দান করেছে।

আহলে বাইত (আঃ) বিশ্ব সংস্থা তার প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই নবুয়তী মিশনের পবিত্র সত্য সঠিক রূপ ও সীমার প্রতিরক্ষাকে তার অন্যতম দায়িত্ব হিসেবে নিয়েছে যা সবসময়ই ইসলামের অমঙ্গলকামী বিভিন্ন দল, মত ও চিন্তা ধারার আক্রমনের লক্ষ্য ছিল।বিশেষভাবে এক্ষেত্রে তাদের লক্ষ্য ছিল আহলে বাইতের (আঃ) পবিত্র আদর্শিক পথ ও তাঁদের মতাদর্শের অনুসারীগণ যারা এ শত্রুদের আক্রমন ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার আকাঙ্খায় সবসময়ই সামনের সারিতে থেকেছে এবং সবযুগেই কাঙ্খিত ভূমিকা রেখেছে।

এ বিশেষ ক্ষেত্রে আহলে বাইতের (আঃ) মতাদর্শে প্রশিক্ষিত আলেমদের অর্জিত অভিজ্ঞতামালায় পূর্ণ গ্রন্থসমূহ সত্যিই অদ্বিতীয়।কারণ এগুলোর শক্তিশালী জ্ঞানগত ভিত্তি রয়েছে যা বুদ্ধি ও যুক্তিভিত্তিক প্রমানের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সকলপ্রকার অন্যায় গোঁড়ামি ও প্রবৃত্তির অনুসরণ হতে দূরে। এ চিন্তাধারা সকল বিশেষজ্ঞ ও চিন্তাবিদের প্রতি এমন আহ্বান রেখেছে যা যে কোন বুদ্ধিবৃত্তি ও সুস্থ বিবেকই মেনে নেয়।

আহলে বাইত (আঃ) বিশ্ব সংস্থা নতুন পর্যায়ে অর্জিত এ অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধ ভাণ্ডার হতে সত্যানুসন্ধানীদের জন্য বেশ কিছু আলোচনা ও লেখা প্রকাশের প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ নিয়েছে। এ লেখাগুলো আহলে বাইতের আদর্শের ছায়ায়

প্রশিক্ষিত ও বিকশিত সমসাময়িক লেখকবৃন্দের অথবা মহান আল্লাহর অনুগ্রহে এ মর্যাদাপূর্ণ মতাদর্শের ছায়ায় আশ্রয়প্রাপ্ত নবীন ব্যক্তিবর্গের।

এ সংস্থা এ সম্পর্কিত গবেষণা প্রকাশ ও প্রচারের মাধ্যমে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় শিয়া আলেমদের মূল্যবান লেখা হতে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্য ছাড়াও তা যেন সত্যানুসন্ধানী দের জন্য সুপেয় পানির উৎস হয় সে ব্রতও তাদের রয়েছে। এতে করে রাসুলের আহলে বাইতের (আঃ) মহান মতাদর্শ কর্তৃক বিশ্ববাসীর জন্য যে মহাসত্য উপস্থাপিত হয়েছে তা সত্যাকাঙ্খীদের কাছে প্রকাশিত হবে। বুদ্ধিবৃত্তির অনুপম পূর্ণমুখিতার ও হৃদয়সমূহের দ্রুত পরস্পর সংযুক্তির এ যুগে তা আরও ত্বরান্বিত হবে নিঃসন্দেহে।

আহলে বাইত (আঃ) বিশ্ব সংস্থা প্রথমেই অত্র গ্রন্থের রচয়িতা শ্রদ্ধেয় হুজ্জাতুল ইসলাম জাফর আল হাদী,অনুবাদক জনাব আবুল কাসেম এবং এটি প্রকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে যারা ভূমিকা রেখেছেন তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে।

আশা করছি এ গ্রন্থটি প্রকাশের মাধ্যমে মহান প্রতিপালকের - যিনি তাঁর রাসুলকে হেদায়েত ও সত্যদ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন যাতে করে সকল দ্বীনের উপর ইসলামকে বিজয়ী করতে পারেন এবং সাক্ষী হিসেবে তিনিই যথেষ্ট - পক্ষ হতে আমাদের উপর অর্পিত মিশনের গুরুদায়িত্বের কিছু অংশ পালনে সক্ষম হয়ে থাকব।

সাংস্কৃতিক বিভাগ
আহলে বাইত (আঃ) বিশ্ব সংস্থা

পরস্পরকে জানার প্রয়োজনীয়তা

وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا

'এবং আমি তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও।'

ইসলামের আবির্ভাবের সময় জাতি ও গোত্রসমূহ পরস্পর অপরিচিত ও বিভিন্ন দলে বিভক্ত ছিল।আরো যথার্থ বললে তারা পরস্পর বিদ্বেষী এবং দ্বন্দ-সংঘাত ও যুদ্ধে লিপ্ত ছিল।কিন্তু একত্ববাদী ধর্ম ইসলামের শিক্ষার কারণে তাদের এই পরস্পর অপরিচিতি পরিচিতিতে, দ্বন্দ-সংঘাত সহযোগিতায় এবং অনৈক্য ঐক্যে পরিণত হয়েছিল। এর ফলশ্রুতিতে একক মহান জাতি হিসেবে তারা আবির্ভূত হয়েছিল এবং এক মহান সভ্যতার জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছিল। সেই সাথে শোষক ও অত্যাচারীদের হাত হতে বিভিন্ন জাতিকে রক্ষা করেছিল এবং এই উম্মাহ বিশ্বের জাতিগুলোর কাছে সম্মানের পাত্র হয়েছিল। এর বিপরীতে অত্যাচারী ও সীমালংঘনকারীদের জন্য তারা আতঙ্ক ও চক্ষুশূল হয়েছিল।

এ সকল সফলতা কখনই অর্জিত হত না যদি না তাদের মধ্যে ঐক্য থাকত এবং ইসলামের ছায়ায় আশ্রয়গ্রহণকারী জাতিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা ও সম্প্রীতি বিরাজ করত। যদিও তারা ছিল বিভিন্ন জাতির, তাদের মধ্যে ছিল মতের ভিন্নতা, সাংস্কৃতিক পার্থক্য, প্রথাগত অমিল, রীতি ও আচারের বিচিত্রতা কিন্তু মৌলনীতি ও আবশ্যকীয় বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে তারা ছিল সমবিশ্বাসী ও ঐকমত্য। তারা বুঝত একতাই শক্তি আর বিভেদই দূর্বলতা।

এ রীতিই অনুসৃত হচ্ছিল কিন্তু যুগের পরিবর্তনে পুনরায় এ পরিচিতি অপরিচিতিতে, সমঝোতা ঘৃণায় পরিণত হল,মাজহাবভিত্তিক দল ও গোষ্ঠীসমূহ একে অপরকে কাফের প্রতিপন্ন করল, পরস্পরের উপর আঘাত আনতে লাগল। ফলে মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হল, গৌরব লুপ্ত হল, ভাবমুর্তি ক্ষুন্ন হল এবং তাগুতী শক্তি নেতৃত্ব ও দিক নির্দেশনাদানকারী এ জাতিকে তুচ্ছ ও হীন মনে করল। এ বিষয়টি এমন পর্যায়ে পৌছল যে এ জাতির মধ্যে শৃগালের ন্যায় ধূর্ত ও নেকড়ের ন্যায় হিংস্র ব্যক্তিবর্গের বিচরণ শুরু হল, আল্লাহর অভিশপ্ত ও মানব

জাতি কর্তৃক ধিকৃত বিজাতীয় শত্রুরা ইসলামী ভূখণ্ডে গুপ্তচরবৃত্তিতে লিপ্ত হল। ফলে এ ভূখণ্ডের সম্পদসমূহ ব্যাপকভাবে লুণ্ঠিত হল, পবিত্র বিশ্বাসসমূহ অসম্মানিত হল, এর অধিবাসীদের সম্মান লম্পট ব্যক্তিদের করুণার অধীন হয়ে গেল, এ জাতির পতনের পর পতন ঘটতে লাগল, পরাজয়ের পর পরাজয় তাদের ললাটে কালিমা এঁকে দিল। সেদিন স্পেন (খৃষ্টানদের হাতে গ্রানাডায়), সামারকান্দ, বোখারা, তাসখন্দ ও বাগদাদে (মোগলদের হাতে) আমরা তা লক্ষ্য করেছি আর আজ ইরাক, আফগানিস্তান ও ফিলিস্তিনে একই চিত্র দেখছি।

এ ঘটনাগুলোতে সেই হাদীসগুলোর কথাই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে যে, তোমরা দোয়া করবে কিন্তু তার কোন উত্তর পাবেনা, সাহায্যের আহ্বান জানাবে কিন্তু তা গৃহীত হবে না। কারণ যখন রোগ এক প্রকারের আর ঔষধ হল আরেক প্রকারের তখন সে ঔষধ দিয়ে এ রোগ সারানো সম্ভব নয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কার্যকারণের নীতির বাইরে বিশ্বজগতকে পরিচালনা করেন না। তাই এ উম্মতের বর্তমান সমস্যার সমাধান তার প্রাথমিক যুগের সমাধানের মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

বর্তমানে ইসলামী উম্মাহ্ তার সত্তা, বিশ্বাস ও ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে সবচেয়ে নগ্ন ও কুৎসিত হামলার শিকার। তাদের শান্তিপূর্ণ মাজহাবী সহাবস্থান ও পরমতসহিষ্ণুতার মধ্যে ফাটল সৃষ্টির মাধ্যমে বিশৃঙ্খলার জন্ম দেয়া হচ্ছে। ফলে তারা ঐক্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কঠিন আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছে। এ সকল আক্রমণ দ্রুত তার পরিণতি ও মন্দ ফল বয়ে আনছে। এ মুহূর্তে তাদের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত কি এটি হওয়া উচিত নয় যে, তারা সংঘবদ্ধভাবে পরস্পর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবে ও তাদের মধ্যকার সম্পর্ককে মজবুত ও দৃঢ় করবে। তাদের বুঝতে হবে তাদের মধ্যে মাজহাব ও ফিরকাগত মতপার্থক্য থাকলেও ধর্মীয় উৎসের দিক থেকে তারা এক কোরআন ও সুন্নাহর অনুসারী, তওহীদ, নবুওত ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তারা সমবিশ্বাসী, নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত, জিহাদ, হালাল, হারাম প্রভৃতি বিষয়ে এক শরীয়তের অনুবর্তী। মহানবী (সঃ) ও তাঁর পবিত্র আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসা এবং তাদের শত্রুদের সঙ্গে সম্পর্কোচ্ছেদের বিষয়ে একই মনোভাবের অধিকারী যদিও এ ক্ষেত্রে কারো মধ্যে আধিক্য ও কারো মধ্যে স্বল্পতা বিদ্যমান অর্থাৎ বন্ধনটি অপেক্ষাকৃত দূর্বলরূপে রয়েছে। একারনেই ইসলামী উম্মাহ্ এক হাতের অঙ্গুলীগুলির সাথে তুল্য যা পরিশেষে একক অস্থিতে সংযুক্ত হয়েছে যদিও তাদের মধ্যে দৈর্ঘ্য ও আকৃতিগত পার্থক্য

রয়েছে। কিংবা কোন হাদীসে এ উম্মতকে একটি দেহের সাথে তুলনা করা হয়েছে যাতে একদিকে বিভিন্ন ধরণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে অন্যদিকে তাদের মধ্যে আকৃতিগত পার্থক্য সত্ত্বেও শারীরতাত্তিক সহযোগিতামূলক সম্পর্ক ও একক ভূমিকা রয়েছে যা তার অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য।

ইসলামী উম্মাহকে একবার একটি হাতের সঙ্গে আরেকবার এক দেহের সাথে তুলনা করার দর্শন সম্ভবত তাই অর্থাৎ বিষয়টি মনে হয় উপরোক্ত সত্যেরই ইঙ্গিত বহন করছে।

পূর্বে ইসলামের বিভিন্ন ফির্কা ও মাজহাবের আলেমগণ কোনরূপ দ্বন্দ্ব-সংঘাত ছাড়াই শান্তিপূর্ণভাবে পাশাপাশি বাস করতেন। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে তারা পরস্পরকে সহযোগিতা করতেন। তাই দেখা গেছে একজন আরেকজনের ফিকাহ্ বা কালামশাস্ত্রের কোন গ্রন্থের ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেছেন, একজন আরেকজনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন, একে অপরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন এবং প্রশংসা করেছেন, একে অপরের মতকে সমর্থন করেছেন, একে অপরকে নিজের সংগৃহীত হাদিস বর্ণনা করার অনুমতি দিয়েছেন, কখনও কখনও এক মাজহাবের বা ফির্কার কেউ অপর মাজহাব বা ফির্কার কারো হতে হাদিস বর্ণনার অনুমতি চেয়েছেন, একজন আরেকজনের পিছনে নামাজ পড়েছেন, একে অপরের জামাআতে ইমামতি করেছেন, এক মাজহাবের অনুসারী অপর মাজহাবের অনুসারীকে জাকাত দিয়েছেন, একে অপরের মাজহাবকে স্বীকৃতি দিয়েছেন ও সত্যতাকে স্বীকার করেছেন। সেসময়ে সমাজের সকল পর্যায়ে বিভিন্ন ফির্কা ও মাজহাবের অনুসারীরা বন্ধুত্ব ও সৌহার্দপূর্ণ মনোভাব নিয়ে পাশাপাশি সহাবস্থান করেছে যেন তাদের মধ্যে কোন বিরোধ ও মতদ্বৈততা নেই। অথচ তারা যুক্তিপূর্ণভাবে একে অপরের মতকে খণ্ডন করতেন, সমালোচনা পর্যালোচনা করতেন। কিন্তু তারা তা করতেন সম্মানের সাথে এবং আদব ও শিষ্টাচার সহকারে বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রেখে।

এরূপ বিস্তৃত সহযোগিতার জীবন্ত ও ঐতিহাসিক অসংখ্য দৃষ্টান্ত সে সমাজে ছিল এবং প্রকৃতপক্ষে সেই পারস্পরিক সহযোগিতার ফলশ্রুতিতেই মুসলিম মনীষীরা ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির পত্তন করতে পেরেছিলেন। এর মাধ্যমেই তারা মাজহাবী স্বাধীনতার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন এবং তাদের নিকট সম্মানের পাত্র হয়েছিলেন।

এটি এমন কোন কঠিন কাজ নয় যে, উম্মাহর বিশেষজ্ঞ আলেমগণ পারস্পরিক মতদ্বৈততার কোন বিষয়ে আলোচনায় বসবেন এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সততা ও নিষ্ঠার সাথে বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা করবেন। সেখানে একে অপরের মত ও যুক্তিকে শ্রবণ করবেন ও সে সম্পর্কে অবহিত হবেন।

এটি বুদ্ধিবৃত্তিক ও উত্তম যে, প্রত্যেক মাজহাব ও দলই তার চিন্তা-বিশ্বাস এবং ফিকাহগত অবস্থানকে একটি মুক্ত ও স্বাধীন পরিবেশে সুস্পষ্টরূপে উপস্থাপনের সুযোগ পাবে। এর ফলে তাদের উপর আরোপিত অভিযোগের অসারতা সহজেই প্রমাণিত হবে ও সন্দেহসমূহের অপনোদন ঘটবে। তদুপরি প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মতৈক্য ও মতভিন্নতার বিষয়সমূহ সম্পর্কে জানতে পারবে। ফলে মুসলমানরা অনুভব করতে পারবে যে বিষয়গুলি তদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে তার পরিমাণ তাদের মতভিন্নতার বিষয় হতে অনেক বেশী যা তাদের মধ্যকার সম্পর্কের বরফ গলাতে সাহায্য করবে।

এ প্রবন্ধটি এ লক্ষ্য অর্জনের পথে একটি পদক্ষেপ। সত্যের সঠিক রূপটি সকলের নিকট তুলে ধরাই এ লেখার উদ্দেশ্য। আল্লাহই তৌফিক দানকারী।

ইমামীয়া জাফরী মাজহাব

(১) জাফরী ফিকাহর অনুসারী ইমামীয়া সম্প্রদায় বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যকার একটি বড় মাজহাব। তাদের মোটামুটি সংখ্যা মুসলমানদের এক চতুর্থাংশ। এ মাজহাবের মূল ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রোথিত যেদিন সুরা আল বাইয়্যেনাহর নিম্নোক্ত আয়াতটি মহান আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়।

ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات اولئك هم خير البرية

অর্থাৎ যারা ঈমান আনে এবং সৎ কর্ম করে তারাই সৃষ্টির সেরা।[১]

সেদিন আল্লাহর রাসুল (সঃ) উপস্থিত সাহাবাদের সামনে হযরত আলীর (আঃ) কাঁধে হাত রেখে বলেনঃ

يا علي انت و شيعتك هم خير البرية

"হে আলী! তুমি ও তোমার শিয়ারাই (অনুসারী) সৃষ্টির সেরা।"

এ হাদিসটি তাবারীর তাফসির গ্রন্থ 'জামেউল বায়ানে',আল্লামা সুয়ূতীর তাফসির গ্রন্থ 'দুররুল মনসুরে', আলুসি বাগদাদীর তাফসির গ্রন্থ 'রুহুল মায়ানী' তে উপরোক্ত আয়াতের আলোচনায় বর্ণিত হয়েছে।

এ সম্প্রদায় ইমাম জাফর সাদিকের (আঃ) ফিকাহর অনুসরণের কারণে তার সাথে সম্পর্কিত এবং এ মাজহাবের অনুসারীরা 'শিয়া' নামে পরিচিত।

(২) এ মাজহাবের অনুসারীরা ইরান, ইরাক, পকিস্তান, ভারত ও আফগানিস্তানে সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় রয়েছেন। পারস্য উপসাগরীয় দেশসমূহ (কুয়েত, বাহরাইন প্রভৃতি), তুরস্ক, সিরিয়া, লেবানন, রাশিয়া ও প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন হতে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশসমূহেও (আজারবাইজান, তুর্কমেনিস্তান প্রভৃতি) বিরাট সংখ্যক জাফরী ফিকাহর অনুসারী রয়েছেন। তাছাড়া ইউরোপের ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানী এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, আফ্রিকা মহাদেশসহ পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশেই শিয়া জনগোষ্ঠী রয়েছে। তাদের অসংখ্য মসজিদ এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান এ সকল দেশে রয়েছে।

১। সূরা আল বাইয়্যেনাহ ৭।

(৩) বিভিন্ন জাতি, বংশ, ভাষা ও বর্ণের মানুষ এ মাজহাবের অন্তর্ভূক্ত। অন্যান্য ফির্কা ও মাজহাবের মুসলমান ভাইদের সাথে তারা শান্তি ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে পাশাপাশি অবস্থান করছে। সকল ক্ষেত্রেই তারা সততা ও নিষ্ঠার সাথে মহান আল্লাহর বাণী 'নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর ভাই' ও 'সৎকর্ম ও সংযমের ক্ষেত্রে তোমরা পরস্পরকে সহযোগিতা কর' এবং মহানবীর বাণী 'মুসলমানগণ অমুসলিমদের বিপরীতে পরস্পর এক হাতের অঙ্গুলীগুলির ন্যায়'[১] ও 'মুমিনগণ একটি দেহের ন্যায়'[২] প্রভৃতির অনুবর্তী হয়ে সবসময়ই অন্যদের (অন্য মাযহাব সমূহের অনুসারী মুসলমানদের) সহযোগিতা করেছে।

(৪) ইসলামী ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে তারা ইসলাম ও মর্যাদাশীল মুসলিম উম্মাহর প্রতিরক্ষায় অগ্রগামী ও প্রজ্বলিত ভূমিকা রেখেছে। তাদের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ও প্রশাসনগুলো ইসলামী সভ্যতায় ব্যাপক ও যুগান্তকারী অবদান রেখেছে। তাদের মধ্যকার চিন্তাবিদ ও আলেমগণ তাফসির, হাদিসশাস্ত্র, কালামশাস্ত্র, উসুল ও ফিকাহশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, রেজাল ও দেরায়া, দর্শন, উপদেশ-মূলক বাণী, রাষ্ট্র ও সমাজবিজ্ঞান, ভাষা, সাহিত্য, অভিধান প্রভৃতি বিষয়ে শত সহস্র ছোট বড় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে ইসলামের ঐতিহ্য, সভ্যতা ও জ্ঞানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। এমনকি তারা চিকিৎসা ও পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞানসহ প্রকৃতিবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় স্মরণীয় অবদান রেখেছে। অধিকাংশ জ্ঞানের ক্ষেত্রেই তারা ছিল প্রতিষ্ঠাতা ও স্থপতির ভূমিকায়। (এসম্পর্কে জানতে সাইয়েদ হাসান সাদর রচিত 'তাসিসুশ শিয়া লি উলুমিল ইসলাম' গ্রন্থ এবং আগা বুজুর্গ তেহরানী রচিত ২৯ খন্ডের গ্রন্থ 'আযযারিয়া ইলা তাসানিফিশ শিয়া' দেখুন। এছাড়া আফেন্দী রচিত 'কাশফুয যুনুন', কাহহালা রচিত 'মোজামুল মুয়াল্লিফিন', সাইয়েদ মুহসেন আমিন আল আমেলী রচিত 'আইয়ানুশ শিয়া' গ্রন্থসমূহ দেখতে পারেন।)

(৫) তারা সেই আল্লাহয় বিশ্বাসী যিনি একক, অদ্বিতীয়, অমুখাপেক্ষী, জন্মদাতা নন, জাতও নন (কেউ তাকে জন্মদান করেনি), তার সমতুল্য কেউ নেই, তিনি নিরাকার, দেহহীন, স্থান, দিক, কাল ও পাত্রের উর্ধ্বে, তাঁর কোন গতি, স্থিতি, পরিবর্তন, উত্তরণ, অবতরণ নেই। যে সব ধারণা মহান আল্লাহর মহিমা, পূর্ণতা, সৌন্দর্য ও পবিত্রতার পরিপন্থী সেগুলো তারা প্রত্যাখ্যান করে।

১। মুসনাদে আহমাদ, খঃ ১, পৃঃ ২১৫।
২। সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল আদাব, পৃঃ ২৭।

তারা বিশ্বাস করে তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, নির্দেশ দান ও বিধিবিধান (শরীয়ত) প্রণয়নের অধিকারী একমাত্র তিনি, অন্য কেউ নয়।তারা বিশ্বাস করে সকল প্রকার শিরক হোক তা প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য, বড় বা ছোট তা মহা অন্যায় ও ক্ষমাহীন অপরাধ।

এ বিশ্বাসসমূহকে তারা বুদ্ধিবৃত্তি ও সুদৃঢ় চিন্তার মাধ্যমে লাভ করেছে যার ভিত্তি হল মহাগ্রন্থ আল কোরআন এবং নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত সহীহ হাদিসসমূহ সেগুলোর উৎসমূল যাই হোক না কেন। তারা ধর্মের মৌল বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কখনই ইসরাইলী (তওরাত ও ইন্‌জিলের বর্ণনা) বা মাজুসী (অগ্নি উপাসক) উৎসের উপর নির্ভর করেনি। কারন ইহুদী, খৃষ্টান ও মাজুসীরা মহান আল্লাহকে মানবের প্রতিকৃতিতে চিন্তা করে, তাঁকে সৃষ্টির সদৃশ ভাবে। কখনও বা তাঁকে অত্যাচারী, অন্যায়কারী, খেলোয়াড় ও উদ্দেশ্যহীন কর্তা মনে করে অথচ এসব বৈশিষ্ট্য হতে তিনি পবিত্র ও অনেক দূরে। মহাপবিত্র ও নিষ্পাপ নবীদের প্রতিও তারা (ইহুদী ও খৃষ্টানগণ) কবিরা গুনাহতে লিপ্ত হওয়ার অপবাদ আরোপ করে।

(৬) তারা বিশ্বাস করে মহান আল্লাহ ন্যায় বিচারক ও প্রজ্ঞাবান। তিনি ন্যায় ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে সৃষ্টি করেন। কোন কিছুই তিনি উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি করেন না, হোক তা পাথর, উদ্ভিদ, প্রাণী, মানুষ, পৃথিবী বা আকাশমণ্ডলী। কারণ উদ্দেশ্যহীন কর্ম প্রজ্ঞা ও ন্যায়ের পরিপন্থী। তদুপরি তা মহান আল্লাহর প্রভূ ও উপাস্য হিসেবে সকল ক্রটিমুক্ত ও পূর্ণতার অধিকারী হওয়ার আবশ্যকতারও পরিপন্থী।

(৭) তারা বিশ্বাস করে তাঁর প্রজ্ঞা ও ন্যায়পরায়ণতার কারণে তিনি পৃথিবীতে মানুষের পদার্পণের সময় হতেই তাদের মধ্যে নবী ও রাসুল প্রেরণ করেছেন। এ প্রেরিত পুরুষদের বৈশিষ্ট্য হল তারা পবিত্র, নিষ্পাপ এবং আল্লাহর পক্ষ হতে ওহীর মাধ্যমে বিস্তৃত ও বিশেষ জ্ঞানের অনুগ্রহপ্রাপ্ত। নবী প্রেরণের উদ্দেশ্য হল মানবজাতিকে পথ প্রদর্শনের মাধ্যমে তাকে তার কাঙ্খিত পূর্ণতায় পৌঁছতে সাহায্য করা অর্থাৎ তাকে সেই আনুগত্যের পথে পরিচালিত করা যা তাকে জান্নাত, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও বিশেষ অনুগ্রহ লাভের উপযুক্ত করবে। নবীদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন হযরত আদম, নুহ, ইবরাহিম, ঈসা, মুসা এবং অন্যান্য নবীগণ যাদের নাম ও বর্ণনা পবিত্র কোরআন ও হাদিসসমূহে এসেছে।

(৮) তারা বিশ্বাস করে, যে আল্লাহর আনুগত্য করবে এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁর নির্দেশ ও বিধিবিধান পালন করবে সে মুক্তি পাবে ও সফলতা লাভ করবে অর্থাৎ প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হবে যদিও সে হাবশী দাস হয়। এক্ষেত্রে বর্ণ ও বংশের কোন ভেদ নেই। আর যদি কেউ তাঁর নির্দেশ অমান্য করে, তাঁর প্রণীত বিধিবিধানকে উপেক্ষা করে অন্য কোন বিধিবিধানকে গ্রহণ ও অনুসরণ করে তবে সে অপমান ও শাস্তির উপযুক্ত এবং ক্ষতিগ্রস্থ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে যদিও সে কোরাইশ বংশের কোন নেতা হয়। মহানবীর হাদিসে এরূপই বর্ণিত হয়েছে।

তারা বিশ্বাস করে মানুষের চুড়ান্ত পুরস্কার ও শাস্তিপ্রাপ্তির দিন হল কিয়ামত যেদিন হিসাব কিতাবের জন্য তুলাদণ্ড স্থাপিত হবে এবং জান্নাত ও জাহান্নামকে আনয়ন করা হবে। মানুষ মৃত্যুর পর কবর ও বারজাখের জীবন অতিবাহিত করার পর কিয়ামতে পুনরুত্থিত হবে। কিন্তু পুনর্জন্মবাদ যাতে পরকাল অস্বীকারকারীরা বিশ্বাস করে তারা তা বিশ্বাস করেনা। কারণ তা পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহকে অস্বীকার করার শামিল।

(৯) তারা বিশ্বাস করে নবীও রাসুলগণের সর্বশেষ ও এ ধারার পরিসমাপ্তকারী হলেন আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম) যিনি তাঁদের সর্বোত্তম ও শ্রেষ্ঠ এবং মহান আল্লাহ তাঁকে সকল গুনাহ ও ভুল-ক্রটি থেকে মুক্ত রেখেছেন। তাঁর গুনাহ ও ভুল-ক্রটি থেকে মুক্ত থাকার বৈশিষ্ট্যটি যেমন নবুয়তের পূর্বেও ছিল তেমন নবুয়তের পরেও ছিল এবং দ্বীন প্রচার ও তাঁর ব্যক্তিগত ও সামাজিক সাধারণ কর্মকাণ্ডসমূহও এ বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হত। মহান আল্লাহ তাঁর উপর পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করেছেন যা অনন্তকালের জন্য মানবতার দিশারী ও মানব জীবনের সকলক্ষেত্রেই নির্দেশনা দানকারী বিধান। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম)[১] তাঁর উপর অর্পিত রেসালতের বাণী যথাযথভাবে পৌঁছিয়েছেন এবং তাঁর উপর অর্পিত আমানত ও দায়িত্ব সততা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন ও এপথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম) জীবন, ব্যক্তিত্ব, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও তাঁর আনীত মুজিযার বিবরণসম্বলিত অসংখ্য গ্রন্থ শিয়ারা

১। ইমামীয়া শিয়াগণ রাসুলের উপর দরুদ পড়ার সময় তাঁর নামের পাশাপাশি তাঁর পবিত্র বংশধরদের উপরও দরুদ পড়ে থাকে। এটি তারা মহানবীর (সাঃ) নির্দেশ মতই করে থাকে যা সিহাহ সিত্তাহসহ অন্যান্য হাদিসগ্রন্থেও বর্ণিত হয়েছে।

রচনা করেছে। তাঁর জীবনেতিহাস সম্পর্কে জানতে শেখ মুফিদের কিতাবুল ইরশাদ, আল্লামা তাবারসীর এলামুল ওয়ারা বিআলামুল হুদা, আল্লামা মাজলিসীর মাওসুয়াতু বিহারিল আনওয়ার এবং সাম্প্রতিক লেখক সাইয়েদ মুহসেন আল খাতামীর মাওসুয়াতুর রাসুল আল মুস্তাফা গ্রন্থসমূহ দেখুন।

(১০) তারা বিশ্বাস করে পবিত্র কোরআন যা জীব্রাইলের (আঃ) মাধ্যমে মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম) উপর অবতীর্ণ হয়েছে তা তাঁর জীবদ্দশাতেই কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাহাবা যাদের শীর্ষস্থানীয় হলেন হযরত আলী (আঃ) কর্তৃক লিখিত, সংকলিত ও সংরক্ষিত হয়েছিল। এ সংকলন ও সংরক্ষণ কর্মটি রাসুলের (সাঃ) সরাসরি নির্দেশ ও তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হয়েছিল। সাহাবাগণ যথার্থরূপে তা মুখস্থ ও অন্তস্থ করেছিলেন এবং এতটা নিখুঁতভাবে সংরক্ষণ করেছিলেন যে কোরআনের বর্ণ, শব্দ, বাক্য (আয়াত) ও সুরার সংখ্যা পর্যন্ত গণণা করে লিখে রেখেছিলেন। তারা মুতাওয়াতির (বহুলভাবে বর্ণিত) সূত্রে এ কোরআনকে কোন বিকৃতি ও পরিবর্তন ছাড়াই পরবর্তী প্রজন্মের নিকট বর্ণনা করেছেন এবং এভাবে তা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বর্ণিত হয়ে আমাদের নিকট পৌঁছেছে। সেই অবিকৃত কোরআনই আজ ইসলামের অনুসারী সকল জাতি, গোত্র ও সম্প্রদায় সকাল-সন্ধ্যা পাঠ করে থাকে। কোরআন সংকলনের ইতিহাস ও কোরআনের অবিকৃত থাকার বিষয়ে শিয়াদের রচিত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কলেবরের অসংখ্য পুস্তিকা ও গ্রন্থ রয়েছে। যেমন- আম্দি যানজানি রচিত তারিখুল কোরআন, আয়াতুল্লাহ খুই রচিত আল বায়ান, মুহাম্মাদ হাদী মারেফাত রচিত আত তামহীদ ফি উলুমিল কোরআন প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

(১১) তারা বিশ্বাস করে আল্লাহর রাসুল (সাঃ) তাঁর মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হলে মহান আল্লাহর নির্দেশে হযরত আলী ইবনে আবি তালিবকে (আঃ) তাঁর স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি ও মুসলমানদের উপর ইমাম বা নেতা মনোনীত করে গিয়েছেন। তিনি রাজনৈতিকভাবে মুসলমানদের নেতৃত্ব দান ছাড়াও তাদেরকে চিন্তাগত দিকনির্দেশনা এবং নৈতিকভাবে প্রশিক্ষিত ও পরিশুদ্ধ করবেন। এ মনোনয়নের ঘোষনা তিনি গাদীরে খুম নামক স্থানে তার জীবনের শেষ বছরে বিদায়হজ্জের ঠিক পরবর্তী সময়ে তার সঙ্গে হজ্জ গমনকারী মুসলমানদের এক বিশাল সমাবেশে –যাদের সংখ্যা কোন কোন রেওয়ায়েত

অনুযায়ী এক লক্ষের বেশী ছিল– দান করেন। এ ঘটনার প্রাক ও পরবর্তী প্রেক্ষাপটে বেশ কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।[১]

তখন নবী (সাঃ) উপস্থিত জনতার প্রতি আলীর হাতে হাত দিয়ে বাইয়াত করার আহ্বান জানান। ফলে মুহাজির ও আনসারদের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ ও প্রসিদ্ধ সাহাবারা তার হাতে বাইয়াত করেন। (বিস্তারিত জানতে দেখুন আল্লামা আমিনীর আল–গাদীর গ্রন্থ যেখানে তিনি বিভিন্ন তাফসীর, ইতিহাস ও হাদীস গ্রন্থসমূহ হতে বিষয়টি বর্ণণা ও প্রমাণ করেছেন)।

(১২) তারা বিশ্বাস করে মহানবীর (সাঃ) মৃত্যুর পর মনোনীত ইমামের দায়িত্ব হল যেমনভাবে রাসুল (সাঃ) তাঁর জীবদ্দশায় মুসলমানদের পরিচালনা করেছেন, দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, তাদের জন্য দ্বীনি বিধিবিধান বর্ণনা করেছেন, চিন্তাগত জটিল সমস্যা সমূহের সমাধান দিয়েছেন, সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের নিষ্পত্তি করেছেন সর্বোপরি তাদের নেতৃত্ব দিয়েছেন তেমনিভাবেই তা পালন করা অর্থাৎ তিনি ঠিক রাসুলের মতই (নেতৃত্ব, পথ নির্দেশনা, শিক্ষা–প্রশিক্ষণ, বিধিবিধান বর্ণনা, চিন্তাগত সমস্যা সমূহের সমাধান দান সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ নিষ্পত্তি প্রভৃতি) এ সকল ক্ষেত্রগুলিতে ভূমিকা পালন করবেন। অবশ্যই ইমাম বা রাসুলের উত্তরাধিকারী

১। (ক) তাবলীগের আয়াত-

« يَاَيُهَاالرَّسولُ بَلِّغْ مَا اُنزِلَ اِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَ اِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْت رِسالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ »

"হে নবী! আপনার প্রভূর নিকট হতে আপনার উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা পৌঁছে দিন,যদি আপনি তা না করেন তবে তাঁর রেসালতের কোন দায়িত্বই আপনি পালন করেননি এবং আল্লাহ আপনাকে মানুষ হতে রক্ষা করবেন।" (সুরা মায়েদা- ৬৭)।

(খ) দ্বীনের পূর্ণতা দানের আয়াত-

« اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الاسلامَ دِيناً »

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম,তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।" (সুরা আল মায়েদা-৩)

(গ) « اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ » "আজকের এইদিনে কাফেররা তোমাদের দ্বীন থেকে নিরাশ হয়ে গিয়েছে। অতএব তাদেরকে ভয় করোনা বরং আমাকে ভয় করো।" (সুরা আল মায়েদা-৩)

(ঘ) « سَأَلَ سائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ - لِّلْكافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ » "একব্যক্তি চাইল সেই আজাব সংঘটিত হোক যা অবধারিত। কাফেরদের জন্য যার প্রতিরোধকারী নেই।"(সুরা মাআরিজ-১,২)

ব্যক্তিত্বকে এমন হতে হবে যার উপর সকল ক্ষেত্রে মানুষ নির্ভর করতে পারে যাতে করে তিনি উম্মতকে পরিচালিত করে নিরাপদ স্থানে ও তীরে পৌছতে পারেন। তিনি নবীর মতই চরিত্র ও বৈশিষ্টে গুণান্বিত হবেন যেমন ঐশী জ্ঞান, পবিত্রতা, নিষ্পাপত্ব ও অনুরূপ যা কিছু তাকে নেতৃত্ব ও দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত করবে শুধু নবুয়ত ও ওহী প্রাপ্তি ব্যতিত। কারণ মুহাম্মদ(সঃ) এর মাধ্যমে নবুয়তের পরিসমাপ্তি ঘটেছে এবং তিনি সর্বশেষ নবী ও রাসুল এবং তার আনীত ধর্ম সর্বশেষ ধর্ম, তাঁর শরীয়ত সর্বশেষ শরীয়ত, তাঁর উপর অবতীর্ণ গ্রন্থ সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ। তাই তাঁর পর কোন নবী নেই, তাঁর ধর্মের পর কোন ধর্ম নেই, তাঁর শরীয়তের পর কোন শরীয়ত নেই। এ বিশ্বাসের বিষয়ে শিয়াদের রচিত অসংখ্য গ্রন্থ রয়েছে যাতে বিষয়টি বিভিন্ন কলবরে ও পদ্ধতিতে প্রমাণ করা হয়েছে ।

(১৩) তারা বিশ্বাস করে উম্মতের জন্য নিষ্পাপ ও পূর্ণতার গুণে গুণান্বিত নেতার প্রয়োজনীয়তার দাবী রাসুলের (সঃ) পর শুধু হযরত আলীর মনোনয়নের মাধ্যমে পূরণ হয়না। বরং এই নেতৃত্বের ধারা দীর্ঘ সময় অব্যাহত থাকা অপরিহার্য। যাতে করে ইসলামের মূল সুপ্রতিষ্ঠিত হয় (সমাজের গভীরে প্রবেশ করে ও স্থায়িত্ব লাভ করে), তার শরীয়তের ভিত্তি সংরক্ষিত হয়, তার আনীত বিধিবিধান সে সকল বিপদ ও আশঙ্কা মুক্ত হয় যে আশংকাগুলি সকল ঐশী ধর্মব্যবস্থা ও বিশ্বাসকে শংকিত করত ও করেছে। এ লক্ষ্যেই একদল মনোনীত ব্যক্তিবর্গকে ইমাম হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছে –যারা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রূপ ভূমিকা রেখেছেন ও প্রচেষ্টা চালিয়েছেন– যাতে করে ইসলামী উম্মতের জন্য সকল পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে গ্রহণীয় উপযোগী পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর ব্যবহারিক উদাহরণ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদেরকে বাস্তব অভিজ্ঞতা দান করা য়ায় ।

(১৪) তারা বিশ্বাস করে মহানবী (সঃ) উপরোক্ত কারণে এবং বিশেষ প্রজ্ঞার ভিত্তিতে মহান আল্লাহর নির্দেশে আলীর (আঃ) পর আরো এগারজন ইমামকেও নির্দিষ্ট করে গিয়েছেন অর্থাৎ আলীসহ (আঃ) বারোজন ইমামের কথা ঘোষণা করেছেন। তাদের সংখ্যা ও তাদের গোত্রের নাম (কোরাইশ) উল্লেখ করে সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে বিভিন্ন শব্দের পার্থক্যে কাছাকাছি অর্থে হাদীসসমূহ বর্ণিত হয়েছে যদিও তাতে তাঁদের নাম ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখিত হয়নি। যেমন মহানবীর (সঃ) হতে বর্ণিত হয়েছেঃ নিশ্চয়ই ততক্ষণ দ্বীন (ইসলাম) সুপ্রতিষ্ঠিত, সমুন্নত ও অব্যাহত থাকবে যতক্ষণ না মুসলমানদের মাঝে বারোজন

নেতার অথবা খলিফার আগমন ঘটবে যারা সকলেই কোরাইশ বংশের হবে অথবা বনি হাশেমের হবে (যেমন কোন কোন গ্রন্থে এসেছে), আবার সিহ্‌হা সিত্তাহর বাইরের কোন কোন গ্রন্থে যেমন ফাজায়েল, মানাকিব, সাহিত্য ও কবিতা গ্রন্থেও তাদের নাম উল্লেখিত হয়েছে। যদিও উল্লিখিত হাদীসগুলিতে সুস্পষ্টরূপে বারো ইমাম অর্থাৎ হযরত আলীসহ তার এগার জন সন্তানের নাম আসেনি কিন্তু জাফরী শিয়াদের বিশ্বাসের সঙ্গেই কেবলমাত্র তা মিলানো সম্ভব নতুবা অন্য কোন ব্যাখ্যাই তার সঙ্গে সাজুয্য রাখেনা। জাফরী শিয়াদের ব্যাখ্যা ব্যতীত অন্য কোন ব্যাখ্যাই এক্ষেত্রে সঠিকত্ব প্রমাণ করতে পারেনি। এজন্য দেখুন আল হায়েরী বাহরানী রচিত 'খুলাফাউন্নাবী' গ্রন্থটি।

(১৫) জাফরী শিয়ারা বিশ্বাস করে বার ইমাম হলেন পর্যায়ক্রমিকভাবে

- ইমাম আলী ইবনে আবি তালিব (রাসুলের (সাঃ) চাচাতো ভাই ও তাঁর কন্যা ফাতিমা যাহরার (আঃ) স্বামী)
- ইমাম হাসান ও হুসাইন (রাসুলের নাতি এবং আলী ও ফাতিমার সন্তানদ্বয়)
- ইমাম যাইনুল আবেদীন আলী ইবনুল হুসাইন (আস সাজ্জাদ)
- ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আলী (আল বাকির)
- ইমাম জাফর ইবনে মুহাম্মাদ (আস সাদিক)
- ইমাম মুসা ইবনে জাফর (আল কাজিম)
- ইমাম আলী ইবনে মুসা (আর রিজা)
- ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আলী (আল জাওয়াদ আততাকী)
- ইমাম আলী ইবনে মুহাম্মাদ (আল হাদী আননাকী)
- ইমাম হাসান ইবনে আলী (আল আসকারী)
- ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (আল মাহদী, আল মওউদ (প্রতিশ্রুত), আল মুনতাজার (প্রতীক্ষিত))[১]

১। আরব ও অনারবদের মধ্য হতে অনেক অসামান্য ও প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও কবি যারা শিয়া নন এই বার ইমামের সকলের নামোল্লেখ করে দীর্ঘ কাসিদা ও গজল রচনা করেছেন। যেমন হাসকাফি, ইবনে তুলুন, আল ফাজল ইবনে রুযবাহন, জামী, ফরিদুদ্দীন আত্তার নিশাবুরী, মাওলানা রুমি। এদের কেউবা হানাফী, কেউবা শাফেয়ী বা অন্য কোন মাজহাবের অনুসারী ছিলেন। আমরা এখানে নমুনা হিসেবে তাদের দু'জন হতে দু'টি কাসীদা উল্লেখ করছি।

প্রথম কাসীদাটি হাসকাফী হানাফী হতে যিনি সপ্তম হিজরী শতাব্দীর একজন আলেম ও কবিঃ

এরাই হলেন আহলে বাইত যাদেরকে রাসুল (সাঃ) আল্লাহর নির্দেশে ইসলামী উম্মাহর নেতা বলে ঘোষণা করেছিলেন কারণ তারা হলেন নিষ্পাপ, গুনাহ ও ভুলত্রুটি হতে মুক্ত এবং তারা তাদের পিতৃপুরুষ হতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বিস্তৃত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন এবং এ জন্যই মহান আল্লাহ তাঁদের

(আলী) হায়দার, তারপর দুই হাসান (হাসান ও হুসাইন)
তারপর আলী ও তার পুত্র মুহাম্মাদ
জাফর সাদিক ও তার পুত্র মুসা
তার পুত্র আলী নেতা ও সর্দার
আর রেজা হল উপাধী তার
তার পুত্র মুহাম্মাদ, তারপর আলী
সত্যের পথে হেদায়াতকারী হলেন তিনি
তারপর হাসান ও তদীয় পুত্র মুহাম্মাদ
এরা হলেন আমার ইমাম ও নেতা।
যদি এ বিশ্বাসের কারণে কোন দল আমাকে করে মিথ্যা প্রতিপন্ন
যেহেতু তাঁরা হলেন ইমাম তাই তাদের সম্মান করে আমি ধন্য
তাঁদের নাম সম্মানের সাথে (সুন্দরভাবে) উচ্চারিত হয়, কখনই প্রত্যাখ্যাত নন
তাঁরা আল্লাহর বান্দাদের উপর তাঁর দলিল ও প্রমাণ
এবং তাঁর দিকে তাঁরাই হলেন পথ ও গন্তব্যস্থল
তাঁরা তাদের প্রভুর জন্য দিনে রোজা পালনকারী
আর রাতের আঁধারে রুকু ও সিজদাকারী।

দ্বিতীয় কাসিদাটি দশম হিজরীর বিশিষ্ট আলেম শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে তুলুনের রচিত। তিনি তার কাসিদায় বলেছেন,

তোমরা বার ইমামকে ধারণ কর
যারা হলেন শ্রেষ্ঠমানব মুস্তাফার বংশের
আবু তুরাব (আলী), হাসান ও হুসাইন
যাইনুল আবেদীনের বিদ্বেষ ত্রুটি বলে গণ্য
মুহাম্মাদ আল বাকির হতে কতইনা জ্ঞান প্রজ্বলিত হয়েছে
আস সাদিক বলে ডাক জাফরকে সবার মাঝে
মুসা হলেন কাজিম (ক্রোধ সংবরণকারী), তাঁর পুত্র আলী
তাকে ভূষিত কর রেজা উপাধিতে কারণ তার মর্যাদা উচ্চ
মুহাম্মাদ আততাকী যার হৃদয় সজ্জিত
আলী আননাকী যার রত্ন সর্বত্র বিক্ষিপ্ত
আল আসকারী আল হাসান তিনি পবিত্র
মুহাম্মাদ আল মাহদী যিনি নিকটেই হবেন আবির্ভূত।

দ্রষ্টব্যঃ আল আইম্মাতু ইসনা আশার, সিরীয় ঐতিহাসিক শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে তুলুন (মৃত্যু ৯৩৫ হিজরী) গবেষনাঃ ডক্টর সালাহউদ্দীন আল মুনাজ্জাদ, বৈরুত হতে প্রকাশিত।

প্রতি ভালবাসা পোষণের ও তাঁদের অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন পবিত্র কোরআনের এই আয়াতগুলিতেঃ

قل لا أسئلكم عليه اجرا الا المودة فى القربى

"বলুন আমি তোমাদের নিকট আমার রেসালাতের দায়িত্বের পুরস্কার স্বরূপ কিছুই চাইনা আমার নিকটাত্মীয়দের সৌহার্দ ও ভালবাসা ছাড়া।"[১] এবং

ياايها الذين آمنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقين

"হে ঈমানদারগণ আল্লাহকে ভয় কর ও সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক।"[২]

বিস্তারিত জানতে এ সম্পর্কিত তাফসীর, হাদিসগ্রন্থসমূহ এবং সিহাহ সিত্তাহর ফাজায়েল অংশ যাতে আহলে বাইতের মর্যাদা শীর্ষক আলোচনা রয়েছে এবং এ বিষয়ক শিয়া সুন্নী উভয় মাজহাবের স্বতন্ত্র গ্রন্থসমূহও দেখুন।

(১৬) জাফরী শিয়ারা বিশ্বাস করে তাদের পবিত্র ইমামগণ যাদের কর্ম ও বাক্যের ক্ষেত্রে কোন ভুল-ত্রুটি বা গুনাহর কথাই ইতিহাসে উল্লেখিত হয়নি (যেমনটি অন্য সকলের ক্ষেত্রেই কমবেশী হয়েছে। তাঁরা তাঁদের বিস্তৃত জ্ঞানের দ্বারা ইসলামী উম্মাহর ব্যাপক কল্যাণ সাধন করেছেন। তাঁরা তাঁদের গভীর জ্ঞানের দ্বারা এ উম্মাহর সংস্কৃতিকে করেছেন সমৃদ্ধ, আকিদা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে দিয়েছেন সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী, ইসলামী শরীয়ত, তাফসীর, হাদীস, ইতিহাস, নৈতিকতা, আদব প্রভৃতি ক্ষেত্রে দিয়েছেন সঠিক দিক নির্দেশনা ও দিব্যদৃষ্টি। তেমনি তাঁরা তাঁদের বাণী ও কর্মের দ্বারা একদল জ্ঞানী, সৎকর্মশীল, কল্যাণকর অসামান্য নারী-পুরুষকে প্রশিক্ষিত করতে পেরেছিলেন যাদের জ্ঞান, মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ও সদাচরনের বৈশিষ্ট্যকে সকলেই স্বীকার করেছেন।

যদিও দুঃখজনকভাবে আহলে বাইতের এই সম্মানিত ইমামদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব হতে দূরে সরিয়ে দেয়া হয়েছিল তদুপরি তাঁরা তাদের সামাজিক ও চিন্তাগত দায়িত্বটি সর্বোত্তমভাবে পালন করেছেন। যাতে করে ইসলামের মৌল বিষয়সমূহ, শরীয়তের বিধিবিধান বিকৃতি হতে রক্ষা পায়। যদি মুসলিম উম্মাহ তাঁদেরকে রাজনৈতিক নেতৃত্বের সেই দায়িত্বটি যা রাসুল (সাঃ) মহান আল্লাহর নির্দেশে তাদের উপর অর্পণ করেছিলেন সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ

১। সুরা শুরা ২৩।
২। সুরা তাওবাহ ১১৯।

দিত তবে এই উম্মাহ তার কাঙ্ক্ষিত সম্মান, মর্যাদা ও সৌভাগ্যকে পূর্ণরূপে লাভ করত এবং তাদের মধ্যে এমন এক ঐক্য, সংঘবদ্ধতা ও পারস্পরিক সমন্বয়ের সৃষ্টি হত যাতে কোন ফাটল থাকত না, কোন বিভেদ ও দ্বন্দ থাকত না, কোন অপমান ও হীনতা থাকত না, থাকত না কোন যুদ্ধ বিগ্রহ।

এ বিয়য়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন আসাদ হায়দার রচিত তিন খণ্ডের গ্রন্থ আল ইমাম আস সাদিক ওয়াল মাজাহেব আল আরবায়া।

(১৭) শিয়াগণ বিশ্বাস করে যে আহলে বাইতের অনুসরণ করা ওয়াজিব ও তাদের নির্দেশিত পথ গ্রহণ করা অপরিহার্য এবং এ কারণেই তাদের আকীদা বিষয়ক গ্রন্থসমূহে এ বিষয়টি প্রমাণ করে বুদ্ধিবৃত্তিক ও রেওয়ায়েত (কোরআন ও হাদীস) নির্ভর অসংখ্য দলিল উপস্থাপিত হয়েছে। কারণ সেটা সেই পথ যা মহানবী (সাঃ) তার উম্মতের জন্য অংকন করেছিলেন এবং তা অনুসরণ ও দৃঢ়ভাবে ধারণের জন্য তাদের প্রতি ওসিয়ত করেছিলেন যা মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হাদীসে সাকালাইনে বর্ণিত হয়েছে।

إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي اهل بيتي ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا ابدا

"আমি তোমাদের মাঝে দু'টি ভারী বস্তু রেখে যাচ্ছি আল্লাহর কিতাব ও আমার রক্ত সম্পর্কীয় আহলে বাইত। যদি তোমরা এ দু'টিকে আঁকড়ে ধর কখনই বিভ্রান্ত হবে না।"

এ হাদীসটি মুসলিম ও তিরমিযী তাদের সহীহ হাদীস গ্রন্থদ্বয়ে ও তাদের অনুরূপ শত শত মুহাদ্দিস প্রতিটি হিজরী শতাব্দীতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা লাশনাভী (লাক্ষ্মাভী) রচিত 'হাদীসুস সাকালাইন' প্রবন্ধে এসেছে এবং আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তিন দশক পূর্বে সেটিকে সত্যায়ন করেছে।

নবীগণ কর্তৃক প্রতিনিধি মনোনয়ন এবং তাদের বিষয়ে সুপারিশ করার বিষয়টি প্রচলিত একটি রীতি যা পূর্ববর্তী নবীদের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। (এ বিষয়ে আলোচনা মাসউদীর ইসবাতুল ওয়াসিয়াহ এবং বিভিন্ন তাফসীর, হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থে এসেছে যা শিয়া সুন্নী উভয় সূত্রেই বর্ণিত হয়েছে।)

(১৮) জাফরী শিয়ারা বিশ্বাস করে ইসলামী উম্মাহর (আল্লাহ তাদের সম্মানিত করুন) উচিত একে অপরকে কটূক্তি ও গালি গালাজ, মিথ্যা অপবাদ আরোপ, গুজব রটানো, ভীতি প্রদর্শন, কটাক্ষ ইত্যাদি (যেমন নিজের অবস্থানকে

প্রমাণ করার জন্য অযাচিত কল্পনা প্রসূত যুক্তি উপস্থাপন) হতে দূরে থেকে পরস্পর অনৈক্যের বিষয়গুলোতে গঠনমূলক আলোচনা পর্যালোচনায় বসা। মুসলিম উম্মাহর সকল ফির্কা, মাযহাব ও সম্প্রদায়ের চিন্তাবিদ ও আলেমগণের উচিত ইসলামী জ্ঞান বিষয়ক আলোচনার জন্য সমবেতভাবে জ্ঞান বিষয়ক পরামর্শ কেন্দ্রের সৃষ্টি করা। জ্ঞানভিত্তিক আলোচনা পর্যালোচনার জন্য সমবেত হওয়া এবং তাদের ধর্মীয় ভাই জাফরী ফিকাহর অনুসারীদের মতসমূহ নিরপেক্ষ, নিষ্ঠাপূর্ণ ও ভ্রাতৃসুলভ মন নিয়ে বস্তুনিষ্ঠতার সাথে বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা, তাদের উপস্থাপিত দলিল প্রমাণসমূহ কোরআন, রাসুল (সাঃ) হতে বর্ণিত সহীহ ও মুতাওয়াতির হাদীসসমূহ এবং রাসুলের ও তাঁর পরবর্তী সময়ের সার্বিক রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনাসমূহ ও বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের আলোকে যাচাই ও মূল্যায়ন করা।

(১৯) জাফরী শিয়ারা বিশ্বাস করে সাহাবা ও যে সকল নারী-পুরুষ রাসুলের (সাঃ) পাশে ছিলেন এবং ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন, ইসলামের প্রচার ও তার ভিত্তিকে মজবুত করার জন্য জান ও মাল দিয়ে সাহায্য করেছেন প্রত্যেক মুসলমানের উচিত তাদেরকে সম্মান করা, তাদের অবদানকে মূল্যায়ন করা এবং তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে রাসুলের (সাঃ) সকল সাহাবাই ন্যায়পরায়ণ ছিলেন (এবং নিরংকুশভাবে সত্য পরায়ণ হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছেন) ফলে তাদের কর্ম ও ভূমিকা সমালোচনা ও পর্যালোচনার উর্ধ্বে রয়েছে। না এরূপ নয়। তারাও সেসব মানুষের অন্তর্ভূক্ত যারা ভুল করেন আবার সঠিক কাজও করেন। ইতিহাস এমন অনেক ঘটনা উল্লেখ করেছে যাতে প্রমাণিত হয় তাদের অনেকেই এমনকি রাসুলের জীবদ্দশায় সৎপথ হতে বিচ্যুত হয়েছিলেন। পবিত্র কোরআনও তার অনেক সুরা ও আয়াতে এরূপ ব্যক্তিবর্গের কথা সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করেছে যেমন সুরা মুনাফিকুন, আল আহযাব, আল হুজুরাত, আত তাহরীম, আল ফাতহ, মুহাম্মাদ ও তওবাহ।

সুতরাং নিখাদ সমালোচনার অর্থ তাদের একটি অংশকে কাফের প্রতিপন্ন করা নয়। কারণ ঈমান ও কুফরের মানদণ্ড সকলের নিকট স্পষ্ট, এ দু'য়ের সীমারেখা ও কেন্দ্রবিন্দুও চিহ্নিত আর তা হলো তওহীদ, রেসালাত, দীনের জরুরী ও অনস্বীকার্য বিষয়সমূহ যেমন নামাজ, রোজা, হজ্ব, জাকাত ইত্যাদি এবং সুস্পষ্ট হারামসমূহ যেমন মদ্যপান, জুয়া, ব্যভিচার, চুরি, সুদ ইত্যাদির মত বিষয়সমূহকে স্বীকার বা অস্বীকার করা।

কিন্তু মহানবীর (সাঃ) আদর্শের অনুসারী প্রত্যেক পরিশুদ্ধ মুসলিমেরই উচিত তার কলম ও জিহ্বাকে সংযত রাখা অর্থাৎ নিকৃষ্ট কথা বলা, অপবাদ আরোপ ও গালিগালাজ হতে দূরে থাকা। যা হোক রাসুলের (সাঃ) অধিকাংশ সাহাবীই সৎকর্মশীল এবং শ্রদ্ধা ও সম্মানের উপযুক্ত ও যোগ্য ছিলেন। কিন্তু রাসুলের প্রকৃত সুন্নত অর্থাৎ তাঁর হতে বর্ণিত নির্ভরযোগ্য ও নির্ভুল (সহীহ) হাদীস সনাক্তকরণের জন্য সাহাবাদেরকে সততা ও ন্যায়ের মানদন্ডে যাচাই করা অপরিহার্য। যখন আমরা জানি তাঁর উপর মিথ্যারোপের বিষয়টি তাঁর মৃত্যুর পর ব্যাপক হারে বেড়ে গিয়েছিল যার ইঙ্গিত তিনি তাঁর জীবদ্দশায়ই দিয়েছিলেন।

এ বিষয়টিই শিয়া সুন্নী উভয় মাজহাবের আলেমদের তৎসম্পর্কিত গ্রন্থ রচনায় বাধ্য করেছিল যেমন সুয়ুতী, ইবনুল জাওযীসহ অনেক আলেমই এ বিষয়ক (জাল হাদীস) মূল্যবান গ্রন্থসমূহ রচনা করেছেন এবং নবী করিম (সাঃ) হতে প্রকৃতই যে হাদীসসমূহ বর্ণিত হয়েছে এবং যে হাদীসসমূহ তার উপর আরোপ করা হয়েছে ও জাল বলে গণ্য সেগুলোকে পরস্পর হতে পৃথক করেছেন।

(২০) জাফরী শিয়ারা প্রতীক্ষিত ইমাম মাহদীতে (আঃ) বিশ্বাস করে। তাদের এ বিশ্বাস রাসুলের (সাঃ) হতে বর্ণিত অসংখ্য হাদীসের ভিত্তিতে প্রমাণিত যেগুলোতে বলা হয়েছে তিনি ফাতিমার সন্তান এবং ইমাম হুসাইনের বংশধারার নবম সন্তান। আমরা জানি ইমাম হুসাইনের (আঃ) বংশধারার অষ্টম সন্তান হলেন ইমাম আসকারী (আঃ) যিনি ২৬০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তাঁর একটির বেশি সন্তান ছিল না যার নাম হল মুহাম্মাদ এবং তিনিই হলেন ইমাম মাহদী। তার উপনাম হল আবুল কাসেম।[১]

মুসলমানদের মধ্যে কিছু নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি তাঁকে দেখেছেন এবং তাঁর শারীরিক ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য এবং ইমামত সম্পর্কে খবর দিয়েছেন। তাঁর ইমামত সম্পর্কিত বিষয়ে তাঁর পিতা হতে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। তিনি পাঁচ বছর বয়সে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যান। কারণ শত্রুরা চেয়েছিল তাঁকে হত্যা করতে কিন্তু আল্লাহ তাকে শেষ যুগে পৃথিবীতে জুলুম ও ফ্যাসাদ

১। সিহাহ সিত্তাহ ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে শিয়া সুন্নী উভয় সূত্রে রাসুল (সাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, শেষ জামানায় আমার বংশধর হতে এক ব্যক্তি আবির্ভূত হবেন যার নাম আমার নামে, তার উপনাম আমার উপনাম, তিনি পৃথিবীকে অন্যায় ও অত্যাচারপূর্ণ অবস্থা হতে পূর্ণ ন্যায় ও আদালত প্রতিষ্ঠা করবেন।

(বিশৃংখলা ও অনাচার) নিশ্চিহ্ন করে ন্যায়ভিত্তিক ইসলামী শাসনব্যবস্থা কায়েমের জন্য সংরক্ষণ করেছেন।

তিনি যে দীর্ঘ জীবন লাভ করেছেন এটি কোন অভূতপূর্ব আশ্চর্যজনক বিষয় নয়। কারণ কোরআনের বর্ণনা মতে ঈসা (আঃ) এখনও জীবিত আছেন অথচ তাঁর জন্মের পর ২০০৮ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে এবং হযরত নুহ (আঃ) তাঁর জাতিকে নয়শত পঞ্চাশ বছর দীনের দাওয়াত দিয়েছেন ও দীর্ঘসময় তাদের সঙ্গে জীবন কাটিয়েছেন। হযরত খিজিরও (আঃ) এখন জীবিত আছেন।

নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান, তাঁর ইচ্ছাই কার্যশীল যার কোন প্রতিরোধকারী নেই। আল্লাহ কি হযরত ইউনুস (আঃ) এর বিষয়ে এর থেকেও আশ্চর্য কিছু বলেননি যে,

فلولا انه كان من المسبحين للبث فى بطنه الى يوم يبعثون

“যদি তিনি আল্লাহর তসবীহ (পবিত্রতা ঘোষণা) না করতেন তবে তাকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত মাছের পেটে থাকতে হত।”[১]

আহলে সুন্নাতের অনেক প্রসিদ্ধ আলেম ও ব্যক্তিত্ব ইমাম মাহদীর (আঃ) জন্ম ও বিদ্যমান থাকার বিষয়টি স্বীকার করেছেন এবং তাঁর নাম, পিতার নাম ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। যেমন,

ক) আব্দুল মুমিন শাবলানৃজী শাফেয়ী তাঁর ‘নুরুল আবসার ফি মানাকিবি আলে বাইতিন্নাবী আলমুখতার’ গ্রন্থে।

খ) ইবনে হাজার আল হাইসামী আল মাক্কী আশ শাফেয়ী তার ‘আস সাওয়ায়েক আল মুহরেকা’ গ্রন্থে বলেছেন, ‘(তাঁর নাম) আবুল কাসেম মুহাম্মাদ আল হুজ্জাত, তাঁর বয়স তাঁর পিতার মৃত্যুর সময় পাঁচ বছর ছিল। তিনি সে বয়সেই পূর্ণ প্রজ্ঞা ও জ্ঞান লাভ করেছিলেন তাঁর উপাধি হল আল কায়েম আল মুন্তাজার।’

গ) আল কুন্দূযী আল হানাফী আল বালখী তার ‘ইয়ানাবিউল মাওয়াদ্দাহ’ গ্রন্থে। এ গ্রন্থটি তুরস্কে উসমানী খিলাফতের সময় সেখানে প্রকাশিত হয়েছিল।

১। সুরা আস সাফ্ফাত ১৪৩-১৪৪।

ঘ) সাইয়েদ মুহাম্মাদ সিদ্দিক হাসান আল কান্দুযী আল বুখারী তার 'আল ইজায়া লিমা কানা ওয়া মা ইয়াকুনু বাইনা ইয়াদাই আস সায়াত' গ্রন্থে। এ গ্রন্থটি প্রাচীন গ্রন্থসমূহের একটি।

সমসাময়িক আলেমদের মধ্যে ডক্টর মুস্তাফা আর রাফেয়ী তার 'ইসলামুনা' গ্রন্থে ইমাম মাহদীর (আঃ) জন্মের বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনার প্রেক্ষাপটে এ ক্ষেত্রে উপস্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ও সমালোচনার জবাব দিয়েছেন।

(২১) জাফরী শিয়ারা নামাজ পড়েন, রোজা রাখেন, তাদের সম্পদের জাকাত ও খোমস দেন, মক্কায় আল্লাহর ঘরে গিয়ে হজ্ব করেন, সারাজীবনে একবার হজ্বের মানাসিক (আচার) পালন করা ওয়াজিব এবং একাধিকবার পালন মুস্তাহাব মনে করেন। তারা সৎকাজের আদেশ করেন, অসৎকাজে নিষেধ করেন, আল্লাহর ও তাঁর রাসুলের (সাঃ) বন্ধুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও তাঁদের উভয়ের শত্রুদের সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করেন, যে সকল কাফের ও মুশরিক ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও উম্মতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাদের বিরুদ্ধে জাফরী শিয়ারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, তারা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পারস্পরিক কর্মকাণ্ড যেমন ব্যবসায়, ভাড়া, বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার আইন, অভিভাবকত্বের নীতিমালা, দুগ্ধপান জনিত সম্পর্কের নীতিমালা, পর্দা সম্পর্কিত বিধান প্রভৃতি সকল আইন ইসলামের সঠিক নীতিমালা ও বিধিবিধান হতে গ্রহন করে থাকে। তারা এ সকল বিধিবিধান তাদের খোদাভীরু পরহেজগার ফকীহগণ হতে-যারা কোরআন ও বিশুদ্ধ সুন্নত, আহলে বাইত হতে বর্ণিত নির্ভরযোগ্য হাদীস, আকল (বুদ্ধিবৃত্তি) ও ইজমার (কোন বিষয়ে আলেমদের ঐকমত্যের) উৎস হতে ইজতিহাদের মাধ্যমে বিধিবিধানসমূহ বের করেন-গ্রহণ করে থাকে।

(২২) তাদের মতে প্রতিদিনের ফরজ নামাজসমূহের জন্য নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। পাঞ্জেগানা নামাজের অর্থাৎ ফজর, জোহর, আসর, মাগরিব, এশা প্রতিটি নামাজ আদায়ের নির্দিষ্ট সময়ে তা আদায় করা সর্বোত্তম। কিন্তু তারা জোহর ও আসরের নামাজ একসঙ্গে এবং মাগরিব ও এশার নামাজ একসঙ্গে আদায় করে। কারণ রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম) অসুস্থতা, অজুহাত, সফর বা বৃষ্টিজনিত কোন কারণ ছাড়াই এ নামাজগুলি একসঙ্গে আদায় করেছেন উম্মতের জন্য বিষয়টি সহজ করার উদ্দেশ্যে। সহীহ মুসলিমে এ বিষয়টি উল্লেখিত হয়েছে। এরূপ একত্রীকরনের সুবিধাটি বর্তমান যুগে সহজেই পরিদৃষ্ট ও স্বাভাবিক বলে পরিগণ্য।

(২৩) তারা অন্যান্য মুসলমানদের মতই আজান দেয়। তবে তাদের আজানের মধ্যে পার্থক্য হল তারা 'হাইয়া আলাল ফালাহ' দু'বার বলার পর 'হাইয়া আলা খাইরিল আমাল' (সর্বোত্তম কর্মের জন্য এসো) বলে। কারণ রাসুলুল্লাহর (সাঃ) সময় আজানে এটি প্রচলিত ছিল কিন্তু খলিফা উমর ইবনে খাত্তাব নিজ ইজতিহাদে এটিকে জিহাদের অন্তরায় অর্থাৎ তা মুসলমানদের জিহাদ হতে ফিরিয়ে রাখে মনে করে আজান হতে বাদ দেন। কারণ নামাজ যে শ্রেষ্ঠ কর্ম মুসলমানরা তা স্বাভাবিকভাবেই জানেন (এ ঘটনাটি আল্লামা আল কুশজী আল আশআরি তার শারহে তাজরিদুল ইতিকাদ গ্রন্থে, আলকিন্দী তার আল মুসান্নাফ গ্রন্থে, আলমুত্তাকী আল হিন্দী তার কানজুল উম্মাল গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, সুন্নী সূত্রের অন্যান্য গ্রন্থেও তা বর্ণিত হয়েছে। খলিফা উমর ইবনে খাত্তাব ফজরের আজানে 'আস সালাতু খাইরুম মিনান নাওম' (নামাজ নিদ্রা অপেক্ষা উত্তম) বাক্যটি সংযোজন করেন যা মহানবীর (সাঃ) সময় আজানের অংশ ছিল না (এ বিষয়ে জানতে হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থসমূহ দেখুন)।

যেহেতু ইসলামে ইবাদত ও তার প্রস্তুতিমূলক বিষয়সমূহ পবিত্র শরীয়তের (তাঁর প্রণেতা ও প্রবক্তা) নির্দেশ ও অনুমতির অনুবর্তী এ অর্থে যে তার প্রতিটি বিধিবিধান অবশ্যই কোরআন ও সুন্নাহর সার্বিক অথবা নির্দিষ্ট দলিল ও সুস্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে হতে হবে নতুবা তা প্রত্যাখ্যাত বিদআত বলে পরিগণিত যা তার (বিদআতের) উদগাতার দিকেই প্রত্যাবর্তন করে... একারণেই ইবাদতের বিষয়সমূহে কম-বেশী করার সুযোগ নেই। শুধু ইবাদতের ক্ষেত্রেই নয় শরীয়তের প্রতিটি বিষয়েই ব্যক্তিগত মত উপেক্ষীয় ও অগ্রহণযোগ্য।

কিন্তু জাফরী শিয়াগণ যে 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ' বলার পর 'আশহাদু আন্না আলীয়ান ওয়ালিউল্লাহ' (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আলী আল্লাহর ওয়ালী) বলে তা রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর পবিত্র আহলে বাইতের সদস্যদের হতে বর্ণিত এ হাদিসের ভিত্তিতে যে জান্নাতের কোন দরজাতেই 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ' বাক্যটি স্বতন্ত্রভাবে নেই বরং তার পাশে অবশ্যই 'আলীয়ুন ওয়ালিউল্লাহ' (আলী আল্লাহর ওয়ালী) বাক্যটি সংযুক্ত রয়েছে। এ বাক্যটির মাধ্যমে শিয়ারা ঘোষণা করতে চায় তারা আলীর (আঃ) নবুয়্যতে বিশ্বাসী নয়। তাঁর উপাস্য বা প্রতিপালক হওয়ার বিষয়টি (নাউজুবিল্লাহ) আসার তো সুযোগই নেই।

শিয়া জাফরী ফিকাহর অনুসারী অধিকাংশ প্রসিদ্ধ আলেম উপরোক্ত কারণে এ মত দিয়েছেন যে, এ বিষয়টি আল্লাহর নিকট কাঙ্খিত ও তাঁর সন্তুষ্টির কারণ মনে করে 'শাহাদাতাইন' বলার পর যদি তা আজানের অংশ বা আজানের ওয়াজিব মনে না করে বলা হয় তবে জায়েয।

তাই এই অতিরিক্ত অংশ যা আজানের অংশ মনে করে বলা হয় না (যেমনটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি) সেসব বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত নয় যার আদৌ কোন শারয়ী (শরীয়তগত) ভিত্তি নেই ফলে এটি বিদআত বলে পরিগণিত হবে না।

(২৪) শিয়াগণ হাদীসের অনুসরণে মাটি, পাথর, নুড়ি প্রভৃতি ভূমির অংশ বলে পরিগণিত বস্তু এবং ভূমি হতে উদ্ভূত বস্তুতে (যেমন উদ্ভিদজাত চাটাই ও মাদুর) সিজদা করে কিন্তু কার্পেট, কাপড়, পরিধেয়, অলংকার ও সাজসজ্জার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার্য বস্তুতে সিজদা করা জায়েয মনে করে না। এ বিষয়ে শিয়া-সুন্নী উভয় সূত্রে অসংখ্য হাদীস রয়েছে যে, রাসুল (সাঃ) সবসময় ভূমি বা মৃত্তিকার উপর সিজদা করতেন এমনকি মুসলমানদেরও তা করার নির্দেশ দিতেন। একারণেই একদিন সাহাবী বেলালকে (রাঃ) মাটির উত্তপ্ততার কারণে পাগড়ীর একাংশে সিজদা করতে দেখে তিনি নিজ হাতে তার কপাল হতে পাগড়ীর কাপড় সরিয়ে দিয়ে বলেন, 'হে বেলাল, তোমার ললাটকে ধূলায়িত কর বা ধূলায় আবৃত হতে দাও'।

রিবাহ এবং সাহিবের প্রতিই তিনি এরূপ কথা বলেছেন যেমন- 'হে সাহিব, তোমার মুখমণ্ডলকে ধূলায়িত হতে দাও' বা 'হে রিবাহ, তোমার মুখমণ্ডলকে ধূলায়িত কর' (এ বর্ণনাসমূহ সহীহ বুখারী, কানজুল উম্মাল, আব্দুর রাজ্জাক রচিত মুসান্নাফ এবং কাশেফুল গিতা রচিত 'আস সুজুদ আলাল আরদ' গ্রন্থে রয়েছে।)

এরূপ করার অন্যতম দলিল হল এ হাদীসটি যা সহীহ বুখারী ও অন্যান্য গ্রন্থে মহানবী (সাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছেঃ

جعلت لی الارض مسجدا و طهورا

"আমার জন্য পৃথিবীকে (ভূ-পৃষ্ঠ) মসজিদ ও পবিত্রকরণের উপকরণ করা হয়েছে।"

তদুপরি মাটির উপর সিজদা বা সিজদার জন্য মাটির উপর কপাল রাখা আল্লাহর সামনে সিজদার সর্বোত্তম রূপ, উপাস্যের সামনে উপাসকের ক্ষুদ্রতা

প্রকাশ ও আত্মসমর্পণের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত এবং বিনয় ও নম্রতার সবচেয়ে নিকটবর্তী। এ বিষয়টি মানুষকে তার মূল উৎসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মহান আল্লাহ কি একথাই বলেননি,

مِنها خَلَقناكُم وَفِيها نُعِيدُكُم وَ مِنها نُخرِجُكُم تارَةً اُخرى

"আমরা তোমাদের তা (মৃত্তিকা) হতেই সৃষ্টি করেছি, তাতেই তোমাদের ফিরিয়ে আনব। পুনরায় (কিয়ামতের দিন) তোমাদের তা হতে বের করে আনব।"[১]

নিশ্চয়ই সিজদা হল বিনয়ের চূড়ান্ত প্রকাশ। বিনয়ের চূড়ান্ত রূপের প্রকাশ জায়নামাজ, কার্পেট, বস্ত্র বা মূল্যবান অলংকারের উপর ঘটে না। এরূপটি তখনই প্রকাশ পায় যখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান অংশ মানুষের ললাট সবচেয়ে মূল্যহীন বস্তু অর্থাৎ মৃত্তিকার উপর রাখা হয়। (বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন দশম হিজরী শতাব্দীর আলেম আশ শারানী আনসারী আল মিসরী রচিত আল ইয়াকিত ওয়াল জাওয়াহির গ্রন্থটি)

হ্যাঁ, অবশ্যই সিজদার মাটি পবিত্র হতে হবে, আর এজন্যই তার পবিত্রতার কথা চিন্তা করে শিয়ারা তাদের সঙ্গে একখণ্ড মাটির টুকরা (বিভিন্ন মাটির মিশ্রনে প্রস্তুত) বহন করে। কখনও কখনও এ সিজদার মাটি বরকত লাভের উদ্দেশ্যে পবিত্র কোন স্থান হতে নেয়া হয়ে থাকে যেমন কারবালা যেখানে মহানবীর (সাঃ) পবিত্র দৌহিত্র ইমাম হুসাইন (আঃ) শহীদ হয়েছিলেন। মহানবীর (সাঃ) কোন কোন সাহাবা বরকত লাভের উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কানগরীতে সফরের সময় সেখান হতে পাথর ও নুড়ি সিজদার জন্য বহন করে নিয়ে যেতেন। (এবিষয়টি সানআনির মুসান্নিফ গ্রন্থে এসেছে)

কিন্তু জাফরী শিয়ারা এরূপ করতেই হবে এবং সবসময় এমনটিই হতে হবে তা অপরিহার্য মনে করে না বরং যে কোন পরিস্কার ও পবিত্র পাথরে সিজদা করা জায়েয মনে করে। যেমন পবিত্র মসজিদে নববী ও মসজিদে হারামের মেঝে যেরূপ পাথরে প্রস্তুত হয়েছে তাতেও সিজদা করাতে কোন অসুবিধা নেই।

নামাজের মধ্যে তারা বাম হাতের উপর ডান হাত রাখে না (হাত বাঁধে না) কারণ মহানবী (সাঃ) এমনটি করতেন না এবং কোন অকাট্য ও সুস্পষ্ট দলিল

১। সুরা ত্ব-হা ৫৫।

এর সপক্ষে নেই। একারণেই মালেকী মাজহাবের অনুসারীরাও তা করে না (বুখারী, মুসলিম ও বায়হাকী দ্রষ্টব্য, মালেকী মাজহাবের মত সম্পর্কে জানতে দেখুন ইবনে রুশদ আল কুরতুবী রচিত বেদায়াতুল মুজতাহিদ সহ অন্যান্য গ্রন্থ)।

(২৫) জাফরী শিয়ারা ওজুর সময় কনুই হতে শুরু করে হাতের অঙ্গুলী পর্যন্ত অর্থাৎ উপর হতে নীচের দিকে ধৌত করে। নীচে থেকে উপর দিকে বা হাতের অঙ্গুলী হতে শুরু করে কনুই ধোয় না। কারণ তারা ওজুর পদ্ধতি আহলে বাইতের পবিত্র ইমামদের হতে গ্রহণ করেছে যাঁরা রাসুল (সাঃ) হতে তা গ্রহণ করেছেন। নবীর (সাঃ) আহলে বাইতের ইমামগণ তাদের প্রপিতার সুন্নাত সম্পর্কে অধিকতর অবহিত। তাই নিশ্চয়ই রাসুল (সাঃ) ওজুর ক্ষেত্রে এরূপ করতেন এবং ইমামগণ সুরা মায়েদার ওজুর আয়াতটিতে (৬নং আয়াত) (الـى) শব্দটিকে (مـع) অর্থে তাফসীর করেছেন। শাফেয়ী আসসাগীর তার 'নেহায়াতুল মুহতাজ' গ্রন্থে এরূপ বলেছেন।

অন্যদিকে একই কারণে তারা তাদের মাথা ও পা মাসেহ করে ধৌত করে না। যেমন ইবনে আব্বাস বলেছেনঃ ওজু হল দু'টি ধৌতকরন এবং দু'টি মাসেহ (আস সুনান ওয়াল মাসানিদ, আল্লামা ফখরুদ্দীন রাজীর তাফসীরে কাবীর গ্রন্থের উপরোক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)।

(২৬) তারা মুতা বিবাহে (অস্থায়ী বিবাহ) বিশ্বাসী যা পবিত্র কোরআন সুস্পষ্টরূপে বৈধ ঘোষণা করেছে এ আয়াতে যে,

فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

"নারীদের মধ্য হতে যাদেরকে তোমরা অস্থায়ীভাবে গ্রহণ করবে তাদেরকে তাদের মোহরানা পরিশোধ কর।"[১]

তাছাড়া রাসুলের জীবদ্দশায় মুসলমানগণ এরূপ বিবাহ করতেন যা খলিফা উমর ইবনে খাত্তাবের শাসনকালের অর্ধেক সময় পর্যন্ত তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং সাহাবারা তা করতেন। এ বিবাহ শরীয়ত সম্মত এবং স্থায়ী বিবাহের সঙ্গে কয়েকটি বিষয়ে তার সাদৃশ্য রয়েছেঃ

১। সুরা আন নিসা ২৪।

প্রথমতঃ এ বিবাহের আওতাভূক্ত নারীকে (পাত্রী) অবশ্যই স্বামীহীন হতে হবে অর্থাৎ তার স্বামী থাকা চলবে না। এ বিবাহের জন্য যে সিগাহ (বিবাহের আকদ) পড়ানো হবে তার ইজাবের পক্ষ হল নারী এবং কবুলের পক্ষ হল পুরুষ।

দ্বিতীয়তঃ অবশ্যই ঐ নারীকে স্থায়ী বিবাহের ন্যায় মোহরানা দিতে হবে যদিও এ বিবাহের ক্ষেত্রে তাকে বিনিময় অর্থ বলা হয়ে থাকে। এ বিষয়টি আল কোরআনের উপরে উল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে।

তৃতীয়তঃ বিচ্ছেদের পর নারীকে অবশ্যই ইদ্দত পালন করতে হবে (যা দু'মাসিকের বা ৪৫ দিনের সমান)।

চতুর্থতঃ নারী একের অধিক পুরুষের সঙ্গে অস্থায়ী বিবাহকালীন সময় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না এবং এই দম্পতির সন্তান তাদের পিতার ঔরসজাত বলে গণ্য হবে।

পঞ্চমতঃ পিতা ও সন্তান এবং মাতা ও সন্তানের মধ্যে সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নিয়ম স্থায়ী বিবাহের অনুরূপ।

স্থায়ী বিবাহের সঙ্গে এই বিবাহের কয়েকটি ক্ষেত্রে অমিল রয়েছে যেমন ভরণপোষণ অপরিহার্য নয়, স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষার অপ্রয়োজনীয়তা, স্বামী স্ত্রী একে অপরের উত্তরাধিকারী না হওয়া, বিবাহের সময়সীমা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই বিচ্ছিন্ন হওয়া অপরিহার্য বিধায় তালাকের কোন প্রয়োজন নেই। আবার আকদে উল্লেখিত সময় হতে বাকী থাকলেও যদি অবশিষ্ট সময় স্বামী স্ত্রীকে প্রদান করে বা তার অধিকারকে পরিত্যাগ করে অর্থাৎ তার হতে হাত গুটিয়ে নেয় তবেও তা বিচ্ছেদের জন্য যথেষ্ট।

এ ধরনের বিবাহ নীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্য হল যেসকল নারী-পুরুষ স্থায়ী বিবাহের প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সরঞ্জাম সংগ্রহে অপারগ হবে এবং স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যু জনিত বা অন্য কোন কারণে যে সকল পুরুষ ও নারী বৈবাহিক জীবন হতে বঞ্চিত তারা যেন তাদের জৈবিক চাহিদা বৈধ উপায়ে পূরণ করতে পারে এবং সম্মানের সাথে সমাজে বাস করতে পারে।

সুতরাং মুতা বা অস্থায়ী বিবাহ প্রধানতঃ সামাজিক সংকট ও নৈতিক বিপর্যয় রোধ এবং ইসলামী সমাজকে বিচ্যুতি, বিশৃংখলা, যেমন খুশী চলা (গুনাহের প্রতি উপেক্ষার ভাব দেখানো) প্রভৃতি হতে রক্ষা করা।

কখনও কখনও অস্থায়ী বিবাহের মাধ্যমে নারী পুরুষ একে অপরকে বৈধভাবে চিনার সুযোগ পায় এবং স্থায়ী বিবাহের পূর্বে একে অপরকে ভালভাবে জানার উদ্দেশ্যে এ বিবাহ সম্পাদিত হয়ে থাকে। ফলে অবৈধ সম্পর্ক, ব্যভিচার, জৈবিক চাহিদাকে দমন করে রাখা, প্রভৃতিকে রোধ করা সম্ভব হয়। এ বিষয়টি বিবিধ সমস্যায় মানুষদেরকে তাদের যৌন চাহিদা পূরনের হারাম ও অবৈধ পন্থাসমূহ (যেমন- ব্যভিচার, হস্তমৈথুন প্রভৃতি) হতে ফিরিয়ে রাখে অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি এক স্ত্রীতে সন্তুষ্ট নয় (বা ধৈর্য ধারণে সক্ষম নয়) অথচ অর্থনৈতিকভাবে তার পক্ষে একাধিক স্ত্রীর ভরণ পোষণ বহন করা সম্ভব নয় অথবা অসচ্ছলতার কারণে যে ব্যক্তির জন্য আদৌ বিবাহ করা সম্ভব নয় অথচ সে চায় নিজেকে হারাম হতে মুক্ত রাখতে তার জন্য উপযুক্ত একটি পদ্ধতি ও উপায় হচ্ছে এ অস্থায়ী বিবাহ যা আল্লাহ্ নির্ধারণ করেছেন।

মোটকথা এই বিবাহটি কোরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক একটি প্রথা এবং দীর্ঘ সময় সাহাবাগণ এ প্রথাটি তাদের জীবনে পালন করেছেন। যদি এটা ব্যভিচার বলে পরিগণিত হয় তবে এর অর্থ হল কোরআন, নবী এবং সাহাবাগণ ব্যভিচারকে বৈধ করেছেন এবং তারা দীর্ঘ সময় ধরে ব্যভিচারে লিপ্ত ছিলেন (নাউজুবিল্লাহ্)।

তদুপরি এ প্রথাটি রহিতকরণের পিছনে কোরআন ও হাদিস ভিত্তিক কোন সুস্পষ্ট ও অকাট্য দলিল নেই।[১]

যদিও জাফরী শিয়ারা কোরআন ও সুন্নাত কর্তৃক প্রবর্তিত ও বৈধ ঘোষিত এ বিবাহকে হালাল ও মুবাহ মনে করে তদুপরি তারা স্থায়ী বিবাহ ও পরিবার গঠনকে প্রাধান্য দেয় কারণ তা সুস্থ ও শক্তিশালী সমাজ গঠনের ভিত্তি।তাই তারা শরীয়তসম্মত এ বিবাহের দিকে না ঝুকে স্থায়ী বিবাহের সুবিধা গ্রহণেই আকাঙ্খী যা আমরা ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি।

এখানে উল্লেখ্য যে, জাফরী শিয়ারা কোরআন, সুন্নাহ এবং আহলে বাইতের ইমামগণের (আলাইহিমুস সালাম) নির্দেশনার অনুসরণে নারীকে সর্বোচ্চ সম্মান দিয়ে থাকে এবং কখনই তার মর্যাদাকর ভাবমূর্তিকে ক্ষুন্ন হতে দেয় না। শিয়া ফিকাহ্ গ্রন্থসমূহ ও তাঁদের ইমামদের হতে বর্ণিত হাদীসসমূহে নারীর মর্যাদা, সম্মান, অধিকার বিশেষতঃ তাঁদের সঙ্গে করণীয় নৈতিক আচরণ,

---

১। বিষয়টির সত্যতা যাচাইয়ের জন্য সিহাহ সিত্তাহ, সুনান ও মুসনাদের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহ যা বিভিন্ন মাজহাবের নিকট রয়েছে দেখুন।

বিবাহ, তালাক, সম্পদের মালিকানা, দুগ্ধদান, সন্তান প্রতিপালন, ইবাদত ও লেনদেন সম্পর্কিত তাদের মর্যাদার উপযোগী বিধিবিধান বর্ণিত হয়েছে এবং এ বিষয়ে সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

(২৭) জাফরী শিয়ারা ব্যভিচার (জেনা), সমকামিতা, সুদ, ঘুষ, অন্যায় মানব হত্যা, মদ্য পান, জুয়া, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, ভেজাল দেয়া, মজুদদারী, ওজনে কম দেয়া, অবৈধ দখল, চুরি, খিয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতা, নাচ-গান, হিংসা-বিদ্বেষ, পবিত্র নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ, অন্যায় অপবাদ দেয়া, চোগলখোরী, বিশৃংখলা সৃষ্টি, মুমিনকে কষ্ট দেয়া, গীবত ও পরনিন্দা করা, গালি গালাজ করা, মিথ্যা বলা, অন্যের উপর মিথ্যারোপ, যাদু করা ইত্যাদি সকল প্রকার কবিরা ও সগীরা গুনাহকে হারাম বলে মনে করে এবং সকল সময় এগুলো থেকে দূরে থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। তারা সমাজকে এগুলো থেকে মুক্ত রাখার নিমিত্তে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় চেষ্টা চালায় যেমন গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ, নৈতিক প্রশিক্ষণ বিষয়ক পুস্তিকা প্রকাশ, আলোচনা সভা, বক্তব্য, কনফারেন্স ও সেমিনার, জুমার নামাজের খুতবাসমূহ ও এরূপ সম্ভাব্য পন্থাসমূহ।

(২৮) তারা উন্নত নৈতিক চরিত্রের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেয়। উপদেশ ও নসিহতকে পছন্দ করে, উপদেশমূলক বক্তব্য শোনার জন্য উদগ্রীব। তাই উপদেশ গ্রহণের আগ্রহ নিয়ে মসজিদ, গৃহ, সম্মেলন কক্ষ সহ সকল উপযুক্ত স্থানসমূহে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও বক্তৃতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। একারণেই তারা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মর্যাদা বৃদ্ধিকারী দোয়াসমূহ পাঠ করে থাকে। গভীর অর্থবহ এই দোয়াসমূহ মহানবী (সাঃ) ও আহলে বাইতের ইমামদের হতে বর্ণিত হয়েছে যেমন- দোয়ায়ে কুমাইল, দোয়ায়ে আবু হামযা সুমালী, দোয়ায়ে সামাত, দোয়ায়ে জাওশানুল কাবীর,[১] দোয়ায়ে মাকারেমুল আখলাক, দোয়ায়ে ইফতিতাহ (রমজান মাসের ইফতারের পর পড়া হয়ে থাকে)। তারা এই দোয়া ও মুনাজাতসমূহ অত্যন্ত মনোযোগ, বিনয় ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি নিয়ে ক্রন্দনরত অবস্থায় সমর্পিত হৃদয়সহ পাঠ করে থাকে। কারণ তা তাদের আত্মিক পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধতা দান করে এবং তাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে। (এই দোয়াগুলি 'মাউসুআতুল আদইয়াতিল জামেয়া (দোয়া সমগ্র)' নামক

১। এ দোয়াটিতে মহান আল্লাহর এক হাজারটি পবিত্র নাম মূল্যবান মুক্তার দানার ন্যায় পরস্পর সমন্বিত হয়েছে।

গ্রন্থে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য এ দোয়াগুলি শিয়াদের প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ সকল দোয়া গ্রন্থে বিদ্যমান)

(২৯) তারা মহানবী (সাঃ) এবং তাঁর পবিত্র আহলে বাইতের ইমাম ও বংশধরদের রওজার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। যেমন পবিত্র মদীনা নগরীর জান্নাতুল বাকীতে ইমাম হাসান মুজতাবা, ইমাম যাইনুল আবেদীন, ইমাম মুহাম্মাদ আল বাকির এবং ইমাম জাফর সাদিকের (আঃ) রওজা, ইরাকের পবিত্র নাজাফ নগরীতে ইমাম আলীর (আঃ) রওজা, কারবালায় ইমাম হুসাইন (আঃ), তাঁর ভ্রাতা, পুত্র, নিকটাত্মীয় এবং সম্মানিত সাহাবাগণ যারা তাঁর সঙ্গে আশুরার দিন (৬১ হিজরীর ১০ই মুহররম) শহীদ হয়েছিলেন তাদের রওজা, সামার্রায় ইমাম হাদী এবং ইমাম আসকারীর (আঃ) রওজা এবং কাজিমিয়ায় ইমাম কাজিম ও ইমাম জাওয়াদের (আঃ) রওজা, ইরানের মাশহাদ নগরীতে অষ্টম ইমাম আলী ইবনে মুসা রেজার (আঃ) রওজা, কোম ও শিরাজে ইমাম মুসা কাজিমের সন্তান ও বংশধরগণ, সিরিয়ার দামেস্কে কারবালার বীরাঙ্গনা নারী সাইয়েদা হযরত যায়নাবের রওজা মোবারক এবং মিশরের কায়রোতে আহলে বাইতের বংশধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নারী সাইয়েদা হযরত নাফিসার রওজা। তাদের রওজার প্রতি সম্মান প্রদর্শন রাসুলের প্রতি সম্মানের নামান্তর। কারণ তারা হলেন তাঁরই বংশধর এবং ব্যক্তির সম্মান তার বংশধরদের সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমেই রক্ষিত হয়ে থাকে, ব্যক্তির সন্তানদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন তার প্রতি সম্মানেরই নামান্তর। এ কারণেই পবিত্র কোরআন ইমরান, ইবরাহিম ও ইয়াকুবের বংশধরদের প্রতি বিশেষ সম্মান দেখিয়েছে ও ভূয়সী প্রশংসা করেছে। যদিও তাদের অনেকেই নবী ছিলেন না তদুপরি বলেছেঃ

إِنَّ اللَّهَ اصطَفَى آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْرَاهِيمَ وَ آلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ

অর্থাৎ নিঃসন্দেহে আল্লাহ আদম, নুহ, ইবরাহিমের বংশধর এবং ইমরানের পরিবারকে মনোনীত করেছেন যারা বংশধর ছিলেন পরস্পরের।"[১]

তাদের রওজার প্রতি সম্মান প্রদর্শন কোরআনের এ আয়াতের অনুসরণে যে,

لنتخذنّ عليهم مسجدًا

"অবশ্যই আমরা তাদের (সমাধির) উপর মসজিদ নির্মাণ করব"[২]

১। সুরা আলে ইমরান- ৩৩,৩৪।
১। সুরা কাহফ ২১।

অর্থাৎ আমরা আসহাবে কাহফের রওজার উপর মসজিদ নির্মান করব। তারা তা করেছিল যাতে করে তাদের রওজার পাশে আল্লাহর ইবাদত করা যায়। কিন্তু কোরআন তাদের এ কর্মের প্রতিবাদ করেনি এবং এটিকে শিরক বলে মনে করেনি। কারণ একজন মুমিন ও মুসলিম কেবলমাত্র আল্লাহর উপাসনা করে, তাঁর জন্যই রুকু ও সিজদা করে। কিন্তু তারা এই ইবাদত তাঁর পবিত্র ওলিদের পবিত্র রওজার পাশে করে থাকে ঐ স্থানের পবিত্রতার কারণে যেমনটি মাকামে ইবরাহিমের ক্ষেত্রে ঘটেছে।হযরত ইবরাহিমের(আঃ) মর্যাদার কারণে এ স্থানটি পবিত্রতা ও সম্মান অর্জন করেছে এবং আল্লাহ বলেছেনঃ

وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبرَاهِيمَ مُصَلًّى

"তোমরা ইবরাহিমের দাঁড়ানোর স্থানকে নামাজের স্থান নির্ধারণ কর।"[২]

সুতরাং যে ব্যক্তি মাকামে ইবরাহিমের পিছনে নামাজ পড়ে ঐ স্থানের উপাসনা করে না। যেমনি কেউ সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাঈ করলে তা ঐ দু'পর্বতের ইবাদত বলে পরিগণিত হয় না। কারণ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য কিছু পবিত্র ও বরকতময় স্থানকে নির্ধারণ করেছেন এবং পরিশেষে ঐ স্থানগুলোকে নিজের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন (অর্থাৎ তাঁর নিদর্শন বলে উল্লেখ করেছেন)। নিশ্চয়ই কিছু দিবস ও কিছু স্থান পবিত্র বলে ঘোষিত যেমন আরাফার দিন (হজ্বের দিবস), আরাফা ও মিনার ভূমি। এ স্থান ও দিবসগুলি আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে সম্মানিত।

(৩০) একই কারণে জাফরী শিয়ারা অন্যান্য সমঝদার মুসলমানদের ন্যায় রাসুল (সাঃ) ও তাঁর পবিত্র আহলে বাইতের সদস্যদের সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্তে তাদের কবর সমূহ যিয়ারত করে থাকে। তারা এটা এজন্য করে যে, এর মাধ্যমে তাদের হতে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং তাঁদের সঙ্গে নতুন করে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় ও যে উদ্দেশ্যে তাঁরা সংগ্রাম ও প্রচেষ্টা চালিয়েছেন সে পথে চলার তাগিদ অনুভব করে। তাদের আদর্শকে রক্ষার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর ব্রত নেয়। কারণ এই পবিত্র স্থানগুলির যিয়ারতকারীরা যিয়ারতের সময় ঐ পবিত্র ব্যক্তিবর্গের সম্মান ও মর্যাদার কথা স্মরণ করে, নামাজ প্রতিষ্ঠা, জাকাত আদায়ের পথে তারা যে কষ্ট সহ্য করেছেন, দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথে তারা যে অবিরত সংগ্রাম করেছেন তা পুনর্মন্থন করে। সেই সাথে মহানবীর

২। সুরা বাকারা ১২৫।

বংশধরদের উপর আপতিত জুলুম ও অত্যাচার ও তাঁদের মজলুমিয়াতের কথা স্মরণ করে মহানবীর (সাঃ) দুঃখের সমব্যথী হয়।

এ বিষয়টিই কি হযরত হামযার (রাঃ) শাহাদাতের সময় রাসুল বলেননি (যেমনটি ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে)-

ولكن حمزة لا بواكى له

"কিন্তু হায় হামযার জন্য কান্নাকাটি করার কেউ নেই?"

তিনি (মহানবী (সাঃ) কি তাঁর প্রিয় পুত্র ইবরাহিমের মৃত্যুতে কাঁদেননি?

তিনি কি জান্নাতুল বাকীতে কবর যিয়ারতে যেতেন না?

তিনি কি এ কথা বলেননিঃ

زوروا القبور فإنها تذكركم بالاخرة؟

"তোমরা কবর সমূহ যিয়রত কর কেননা তা তোমাদের আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে।"[১]

হ্যাঁ মহনবীর (সাঃ) পবিত্র আহলে বাইতের ইমামগণের কবর যিয়ারত এবং তাতে তাঁদের জীবন পদ্ধতি ও ঐতিহাসিক সংগ্রামী ভূমিকার যে কথা স্মরণ করা হয় তা পরবর্তী প্রজন্মকে ইসলামের প্রতি এই মহান ব্যক্তিবর্গের আত্মোৎসর্গী অবদানের সাথে পরিচিত করায়, তাদের মনে শাহাদাত, আত্মত্যাগ, সাহসিকতা ও বীরত্বের বীজ বপিত হয় এবং আল্লাহর পথে তারা আত্মোৎসর্গে অনুপ্রাণিত হয়।

সুতরাং উপরিউক্ত কর্মটি একটি বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন সভ্য ও মানবিক কর্ম এবং প্রত্যেক জাতিই তাদের শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে, তাদের সভ্যতার স্থপতিদেরকে চিরস্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে তাদের স্মৃতিকে বিভিন্নভাবে জাগরুক রাখে। কারণ এটি তাদের গৌরবময় ভূমিকা সম্পর্কে পরবর্তী প্রজন্মকে অবহিত করে ও তারাও গৌরবান্বিত হয় এবং ঐ আদর্শকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হওয়ার অনুপ্রেরণা পায়।

১। সাবকি আশ শাফেয়ী, শিফাউস সিকাম পৃঃ ১০৭। অনুরূপ সুনানে ইবনে মাজা খঃ ১ পৃঃ ১১৭।

কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে নবী, ওয়ালীগণ ও পূণ্যবান ব্যক্তিবর্গের কর্ম ও আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করেছে এবং তাদের কাহিনী বর্ণনা করেছে তাও এ উদ্দেশ্যেই।

(৩১) জাফরী শিয়ারা আল্লাহর রাসুল (সাঃ) ও তাঁর পবিত্র আহলে বাইতের ইমামগণের শাফায়াত প্রার্থনা করে ও তাঁদের উসিলা দিয়ে মহান আল্লাহর নিকট তাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা, রোগমুক্তি এবং মনের ইচ্ছা পূরণের জন্য দোয়া চায়। কারণ কোরআন শুধু এ জন্য অনুমতিই দেয়নি বরং সকলকে এরূপ করার জন্য আহবান জানিয়ে বলেছেঃ

وَلَو أَنَّهُم إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُم جاءُوكَ فاستَغفَرُوا اللهَ واستغفرَ لهم الرَسُولُ لوَجَدُوا اللهَ توَّاباً رَحيماً

"এবং যখন তারা নিজেদের উপর জুলুম করেছিল তখন যদি রাসুলের কাছে এসে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রাসুল ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, তবে মহান আল্লাহকে তারা তওবা গ্রহণকারী ও দয়ালু হিসেবে পেত।"[১]

অন্যত্র বলেছেঃ

وَلَسَوفَ يُعطِيكَ رَبُّكَ فَتَرضى

"তোমার প্রভু অতি নিকটেই তোমাকে এতটা দিবেন যে তুমি তাতে সন্তুষ্ট হবে।"[২]

শাফায়াত করার মহান মর্যাদার কথাই এ আয়াত গুলোতে বলা হয়েছে। কিরূপে সম্ভব মহান আল্লাহ্ তাঁর নবীকে গোনাহগারদের জন্য শাফায়াতের অধিকার ও মর্যাদা দিয়ে এবং তাকে বান্দাদের মনের ইচ্ছা পূরণের উসিলা হিসেবে ঘোষণা দিয়ে তাদেরকে তার হতে শাফায়াত চাইতে বারণ করবেন অথবা তাঁর নবীকে এ মর্যাদাকর পদের ব্যবহারে বাধা দিবেন?

মহান আল্লাহ্ কি হযরত ইয়াকুবের (আঃ) সন্তানদের বিষয়ে বর্ণনা করেননি যে তারা তাদের পিতার নিকট শাফায়াত চেয়েছিল এ বলে যে,

يَا أَبانا استَغفِرلَنا ذُنوبَنا إنّا كُنّا خاطِئِينَ

১। সুরা আন নিসা ৬৪।
২। সুরা দ্বোহা ৫।

"হে আমাদের পিতা, আমাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই আমরা অন্যায়কারী"[১]

কিন্তু আল্লাহর সম্মানিত ও নিস্পাপ নবী ইয়াকুব (আঃ) তাদের একথায় কোন আপত্তি তো জানানই নি বরং বলেছেনঃ

سَوفَ اَستَغفِرُ لَكُم

"তোমাদের জন্য (আল্লাহর নিকট) ক্ষমা চাইব"[২]

কোন ব্যক্তির পক্ষেই এ দাবী করা সম্ভব নয় যে নবী ও ইমামগণ (আঃ) মৃত, তাই তাদের নিকট দোয়া চাওয়া অর্থহীন। কারণ নবীগণ বিশেষতঃ মহানবী (সাঃ) জীবিত। পবিত্র কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াত এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করেঃ

وَ كَذٰلِكَ جَعَلناكُم اُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهداء عَلى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيكُم شَهِيداً

"এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী জাতি করেছি যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলীর জন্যে এবং যাতে রাসুল সাক্ষ্যদাতা হন তোমাদের জন্য।"[৩]

অন্যত্র বলেছেনঃ

وَ قُلِ اعمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُم وَ رَسُولُهُ وَالمُؤمِنون

"তোমরা তোমাদের কাজ কর নিশ্চয়ই আল্লাহ, তাঁর রাসুল, ও মুমিনগণ তোমাদের কর্মসমূহ দেখবেন।"[৪]

এ আয়াত সমূহ কিয়ামত পর্যন্ত অর্থাৎ যতদিন সূর্য, চন্দ্র এবং দিবা-রাত্রির আবর্তন থাকবে ততদিন অব্যাহত ও কার্যকরী থাকবে।

১। সুরা ইউসুফ ৯৭-৯৮।
২। সুরা ইউসুফ ৯৮।
৩। সুরা বাকারা ১৪৩।
৪। সুরা তাওবাহ ১০৫।

তাছাড়া মহানবী (সাঃ) এবং তাঁর পবিত্র আহলে বাইতের ইমামগণ হলেন শহীদ এবং শহীদেরা জীবিত যেমনটি আল্লাহ পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন স্থানে বলেছেন।

(৩২) জাফরী শিয়ারা মহানবী (সাঃ) ও তাঁর পবিত্র আহলে বাইতের ইমামদের (আঃ) জন্মদিনে উৎসব এবং মৃত্যুদিবসে শোক পালন করে। তারা এ দিবসগুলিতে তাদের মর্যাদা, গৌরবময় ভূমিকা ও অবদানসমূহ নির্ভরযোগ্য সূত্র হতে বর্ণনা করে থাকে। এ কাজটি তারা পবিত্র কোরআনের –যাতে মহানবী (সাঃ) সহ অনেক নবীরই মর্যাদাপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করেছে ও ঐ বৈশিষ্ট্যসমূহের কারণে তাদের প্রশংসা করেছে এবং এর মাধ্যমে দৃষ্টিসমূহকে সেগুলোর প্রতি নিবদ্ধ করেছে যাতে করে তাদের বৈশিষ্ট্যের অনুসরণ করে ও জীবনী হতে শিক্ষা লাভ করে– অনুসরণে করে ।

অবশ্য জাফরী শিয়ারা এ সকল উৎসবে হারাম কর্ম হতে বিরত থাকে যেমন- নারী-পুরুষের মিশ্রণ, নিষিদ্ধ খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ, নবী ও ইমামদের অতিরঞ্জিত প্রশংসা যা তাদেরকে স্রষ্টা, উপাস্য বা প্রতিপালকের পর্যায়ে পৌছানোর নামান্তর[১] এবং এরূপ ইসলামের পবিত্র শরীয়তের বিধান পরিপন্থী ও সুস্পষ্ট সীমা বহির্ভূত যে কোন বিষয় যা কোরআনের আয়াত, নির্ভরযোগ্য ও সহীহ হাদীস এবং সঠিক প্রক্রিয়ায় কোরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে হস্তগত নির্ভরযোগ্য সর্বজনীন দলিলের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তা অবশ্যই পরিত্যাগ করে।

(৩৩) জাফরী শিয়ারা মহানবী (সাঃ) ও তাঁর পবিত্র আহলে বাইতের বাণী ও হাদীসসমৃদ্ধ গ্রন্থসমূহ হতে উপকৃত হয়ে থাকে যেমন সিকাতুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াকুব কুলাইনী রচিত 'আল কাফী', শেখ সাদুক রচিত 'মান লা ইয়াহজারুহুল ফাকিহ', আল্লামা শেখ তুসী রচিত 'আল ইসতিবসার' ও 'আত তাহজীব' গ্রন্থ চারটি শিয়া হাদীস শাস্ত্রের অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থসমূহের অন্তর্ভূক্ত।

যদিও এই গ্রন্থসমূহ সহীহ হাদীসসমূহে পূর্ণ তদুপরি তাদের রচয়িতা ও সংকলকগণ এমনকি কোন জাফরী শিয়াই এই হাদীসগ্রন্থগুলোকে সহীহ নামকরণ করেনি। একারণেই শিয়া ফকিহগণ এই গ্রন্থসমূহের সকল হাদীসকে

১। আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে স্বাধীনভাবে তারা কিছু করতে পারেন এমন বিশ্বাস রাখা যেমনটি ইহুদী ও খৃষ্টানরা নবীদের বিষয়ে করে থাকে।

সহীহ্ অভিহিত করেন না এবং সহীহ্ বলে মানতেও বাধ্য নন। বরং তারা দলিল ও সনদ যাচাই-বাছাইয়ের পর সহীহ বলে প্রতিপন্ন হলে তখনই তা সহীহ্ বলে মেনে নেন এবং যা সহীহ্ বা হাসান হাদীস, রিজাল ও দেরায়াশাস্ত্রের নীতির ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য অন্যান্য প্রকারগুলির অন্তর্ভূক্ত না হয় তা পরিত্যাগ করেন।

(৩৪) তারা ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস, ফিকাহ্, দোয়া ও নৈতিকতা বিষয়ে আহলে বাইতের পবিত্র ইমামগণ হতে বর্ণিত বিভিন্ন বক্তব্য ও বাণীসমূহ যা হাদীসগ্রন্থ ব্যতিত অন্যান্য গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে সেগুলোকেও মূল্য দেয় যেমন সাইয়েদ আর রাজী (রহঃ) সংকলিত 'নাহজুল বালাগা' যা আমিরুল মুমিনীন ইমাম আলী (আঃ) এর বক্তৃতা মালা, পত্র ও প্রজ্ঞাপূর্ণ সংক্ষিপ্ত বাণীসমূহের সমাহার।

অনুরূপ ইমাম আলী ইবনে হুসাইন যাইনুল আবেদীনের দোয়াসমূহের সংকলন 'সাহীফাতুস সাজ্জাদিয়া' এবং 'অধিকার ও কর্তব্য' বিষয়ক দিক নির্দেশনামূলক পুস্তিকা 'রিসালাতুল হুকুক', ইমাম আলীর বাণী সমৃদ্ধ 'সাহীফাতুল আলাভীয়াহ' শেখ সাদুক (রহঃ) সংকলিত ইমামদের হতে বর্ণিত হাদীস সমৃদ্ধ গ্রন্থসমূহ যেমনঃ উয়ুনু আখবারির রেজা, আত তাওহীদ, আল খিসাল, ইলালুশ শারায়ে, মাআনীল আখবার প্রভৃতি। (এই গ্রন্থগুলির কোনটি আকীদা বিষয়ক, কোনটি আখলাক বা নৈতিকতা বিষয়ক, কোনটি বা সামাজিক, পারিবারিক ও ব্যক্তিজীবনের দিক নির্দেশনামূলক।)

(৩৫) কখনও কখনও জাফরী শিয়ারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের[১] হাদীসগ্রন্থে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণিত সহীহ হাদীসসমূহের উদ্ধৃতি দিয়ে থাকে এবং কোনরূপ গোঁড়ামী, অহংকার ও সংকীর্ণতা ছাড়াই তারা তা গ্রহণ করে। তাদের রচিত প্রাচীন ও বর্তমান গ্রন্থসমূহ এর সাক্ষ্য বহন করছে। এ হাদীসসমূহের মধ্যে মহানবীর (সাঃ)

১। এখানে উল্লেখ্য যে, ইমামীয়া শিয়াগণও আহলে সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত। কারণ তারা মহানবীর (সাঃ) কাওলী (قولی) ফেলী (فعلی) ও তাকরীরী (تقریری) সকল সুন্নাতের অনুসরণ করে। মহানবীর (সাঃ) অন্যতম নির্দেশ ও অসিয়ত ছিল এটাই যে, তাঁর আহলে বাইতের নির্দেশকে আঁকড়ে ধরা। আর তাই তারা তাঁদের নির্দেশকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যথার্থভাবে পালন করে থাকে। এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ হল তাদের কালামশাস্ত্র, ফিকাহ ও হাদীস গ্রন্থসমূহ। সম্প্রতি রাসুল করিম (সাঃ) হতে শিয়া সূত্রে বর্ণিত হাদিসসমূহের সমন্বয়ে দশাধিক খণ্ডের বৃহৎ এক গ্রন্থ 'সুনানুন্নাবী (সাঃ)' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

স্ত্রীগণ, প্রসিদ্ধ সাহাবীগণ, বহুল বর্ণনার রাবীগণ যেমন আবু হুরায়রা, আনাস ইবনে মালিক ও অন্যান্যদের বর্ণিত হাদিসসমূহ রয়েছে। শিয়ারা যে হাদিসগুলো সহীহ এবং কোরআন, সহীহ হাদিসসমূহ, সঠিক বুদ্ধিবৃত্তি ও আলেমদের সর্বসম্মত মতের বিরোধী না হয় তা গ্রহণ করতে কোন দ্বিধা করে না।

(৩৬) জাফরী শিয়ারা বিশ্বাস করে ইসলামের প্রাথমিক যুগ হতে বর্তমান পর্যন্ত মুসলমানদের উপর যত কষ্ট, বিপদ ও বিপর্যয় এসেছে তার কারণ হল এ দু'টি–

প্রথমতঃ মহানবীর (সাঃ) আহলে বাইতের নেতৃত্বকে উপেক্ষা, তাঁদের নির্দেশনা ও প্রশিক্ষণকে অগ্রাহ্য করা বিশেষতঃ কোরআনের ক্ষেত্রে তাঁদের বর্ণিত ব্যাখ্যা ও তাফসীর হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

দ্বিতীয়তঃ মুসলমানদের বিভিন্ন দল ও মাজহাবের অনুসারীদের মধ্যে বিদ্যমান অনৈক্য, বিভেদ ও সংঘর্ষ।

একারণেই জাফরী শিয়ারা সবসময় প্রচেষ্টা চালিয়েছে ইসলামী উম্মাহর বিভিন্ন দলের মাঝে ঐক্য স্থাপন করার এবং সকল মাজহাব ও দলের প্রতিই তারা ভ্রাতৃসুলভ ভালবাসার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, বিভিন্ন দল ও মাজহাবের আলেমদের মতামতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছে।

এ লক্ষ্যেই জাফরী শিয়ারা ইসলামের প্রথম যুগ হতেই তাদের তাফসীর, কালাম ও ফিকাহ শাস্ত্রের গ্রন্থগুলিতে আহলে সুন্নাতের আলেমদের মতামতকে এনেছেন। যেমন- শেখ তুসী তার 'খেলাফ' গ্রন্থে আহলে সুন্নাহর আলেমদের ফিকহী মতসমূহ উল্লেখ করেছেন, আল্লামা তাবারসী তার তাফসীর গ্রন্থ 'মাজমাউল বায়ানে' তাদের তাফসীর বিষয়ক মতসমূহ এনেছেন। আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের আলেমগণ এ কর্মের জন্য তাঁর প্রশংসা করেছেন।

অনুরূপ দেখা গেছে শিয়া আলেমদের গ্রন্থের ব্যাখ্যাগ্রন্থ কোন সুন্নী আলেম রচনা করেছেন যেমন শেখ নাসিরুদ্দীন তুসীর 'তাজরীদুল ইতিকাদ' নামক আকীদা বিষয়ক গ্রন্থের ব্যাখ্যাগ্রন্থ সুন্নী আলেম আলাউদ্দীন আল কুশচী রচনা করেছেন যিনি আশআরী চিন্তাধারার অনুসারী ছিলেন।

(৩৭) জাফরী শিয়াদের শীর্ষস্থানীয় আলেমগণ সবসময়ই ইসলামের বিভিন্ন মাজহাব গুলির মধ্যে আকীদা, ফিকাহ ও ইতিহাসগত বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন এবং মুসলমানদের

সময়সাময়িক সমস্যার সমাধানে পারস্পরিক মত বিনিময়ে আগ্রহী। সেই সাথে একে অপরকে অপবাদ দান, মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করা, কটূক্তি ও গালিগালাজের মাধ্যমে পরিবেশ বিষাক্ত করা হতে বিরত থাকাকে অপরিহার্য মনে করে যাতে করে ইসলামী উম্মাহর পরস্পর বিচ্ছিন্ন দল ও অংশগুলোর মধ্যে যুক্তিপূর্ণ সমঝোতা ও ঐক্যের উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় এবং ইসলাম ও মুসলমানদের সেই শত্রুদের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা সম্ভব হয় যারা মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান অনৈক্য ও বিভেদের ক্ষেত্রগুলোর অনুসন্ধানে রয়েছে যা কাজে লাগিয়ে সমগ্র উম্মাহর উপর বিনাশী হামলা চালানো যায়। এ ক্ষেত্রে মুসলমানদের কোন দলকেই তারা ছাড় দিবে না। একারণেই জাফরী শিয়ারা এক আল্লাহ ও শেষনবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর প্রতি বিশ্বাসী এবং কাবাকে কিবলা হিসেবে গ্রহণকারী কোন মুসলমানকেই কাফের বলে না, এ ক্ষেত্রে সে যে কোন মাজহাবেরই অনুসারী হোক বা যে কোন আকীদা বিশ্বাসই পোষণ করুক যদি না সে সমগ্র উম্মাহর সাধারণ মৌলিক বিশ্বাসের পরিপন্থী বিশ্বাস রাখে যা তাকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। এরূপ মুসলমানদের প্রতি শিয়ারা কখনও শত্রুতা পোষণ করেনা, তাদের উপর কোনরকম আক্রমণকে প্রশ্রয় দেয় না। বরং ইসলামের প্রতিটি দল ও মাজহাবের ইজতিহাদী মতকে তারা সম্মান করে। যদি অন্য কোন মাজহাবের অনুসারী জাফরী ফিকাহ ও শিয়া ইমামীয়া বিশ্বাসকে গ্রহণ করে সে ক্ষেত্রে যদি তার নামাজ, রোজা, হজ্ব, জাকাত, বিবাহ, তালাক, ক্রয়-বিক্রয় সহ সকল কর্ম পূর্ববর্তী ফিকাহ অনুযায়ী সঠিকভাবে করে থাকে তবে তাকে ঐ আমলগুলোকে পুনরায় আদায় করতে হবে না। (কোন কোন মুজতাহিদের মতে) যে ওয়াজিবসমূহ কাজা হয়েছে তাও আদায় করতে হবে না। অনুরূপ তার পূর্ব অনুসৃত মাজহাবের বিধান অনুযায়ী সম্পন্ন বিবাহ ও তালাকও পুনরায় কার্যকর করার প্রয়োজন নেই।

ইমামীয়া শিয়ারা তাদের মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দের সাথে সকল স্থানেই ভ্রাতা ও নিকটাত্মীয়ের ন্যায় সৌহার্দ ও সুসম্পর্ক বজায় রেখে বসবাস করছে।

কিন্তু তারা কোন অবস্থাতেই সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা সৃষ্ট বিকৃত সম্প্রদায়-গুলোকে (বাহায়ী, বাবী, কাদিয়ানী ও এতদসদৃশদের) প্রশ্রয় দেয় না বরং তাদের কঠোর বিরোধিতা করে ও অনুরূপ চিন্তার বিস্তৃতির পথে শক্ত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির প্রয়াসী।

যদিও জাফরী শিয়ারা কোন কোন ক্ষেত্রে তাকীয়ার নীতি গ্রহণ করে। তাকীয়ার অর্থ হল যে, তাদের মাজহাবে তারা যা বিশ্বাস করে বিশেষ ক্ষেত্রে তা গোপন করা। এটি কোরআন ঘোষিত একটি বৈধ ও শরীয়ত সম্মত নীতি যা ইসলামের বিভিন্ন মাজহাবের মধ্যে প্রচলিত একটা পন্থা যা তীব্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও সংঘর্ষ এড়াতে গৃহীত হয়ে থাকে। দু'টি লক্ষ্যে তা করা হয়ঃ

প্রথমতঃ নিজেদের জীবন রক্ষায়, যাতে করে বৃথা রক্তপাত এড়ানো যায়।

দ্বিতীয়তঃ মুসলমানদের ঐক্যের স্বার্থে যাতে করে তাদের সংহতিতে কোন ফাটল সৃষ্টি না হয়।

(৩৮) জাফরী শিয়ারা লক্ষ্য করেছে বর্তমানে মুসলমানরা পিছিয়ে থাকার কারণ তাদের চিন্তাগত, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত পশ্চাদপদতা। এক্ষেত্রে আরোগ্য ও মুক্তির রহস্য নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মুসলমানের জাগ্রত হওয়ার মধ্যে নিহিত রয়েছে এবং তাই তাদের জ্ঞান, চিন্তা ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্র যেমন- বিশ্ববিদ্যালয়, একাডেমী প্রতিষ্ঠা এবং সেখানে শিল্প, স্থাপত্য, প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আধুনিক জ্ঞান দান করার মাধ্যমে তাদেরকে কার্যক্ষেত্রের উপযোগী করে গড়ে তোলা। এর ফলে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও কর্মপ্রেরণা সৃষ্টি হবে এবং তারা স্বনির্ভরতা অর্জনের মাধ্যমে বিজাতীয়দের উপর নির্ভরতা ও অনুকরণ হতে চিরতরে মুক্তি লাভ করবে।

এ কারণেই প্রথম হতেই জাফরী শিয়ারা যেখানেই গিয়েছে ও বসতিস্থাপন করেছে সেখানেই শিক্ষা ও জ্ঞানকেন্দ্র স্থাপন করেছে এবং বিভিন্ন জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ তৈরীর নিমিত্তে গবেষণা প্রতিষ্ঠান তৈরী করেছে। আবার তেমনি প্রতিটি দেশেই তারা বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষনা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে অগ্রগামী হয়ে প্রবেশ করেছে এবং তাদের মধ্য হতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও কৌশলীরা বেরিয়ে এসেছে যারা উন্নত ও শীর্ষস্থানীয় জ্ঞানকেন্দ্রসমূহ স্থাপন করেছে।

(৩৯) জাফরী শিয়ারা আহকামের বিষয়ে অনুসরণের (তাকলিদ) ক্ষেত্রে তাদের আলেম ও ফকিহদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তারা তাদের নিকট হতে ফিকাহগত সমস্যার সমাধান লাভ করে এবং জীবনের সকল দিক ও ক্ষেত্রে তাদের ফকিহদের মতানুসারে আমল করে। কারণ তাদের বিশ্বাস হল ফকিহগণ পবিত্র ইমামদের ধারার সর্বশেষ ইমামের সাধারণ প্রতিনিধি।

অন্যদিকে যেহেতু শিয়া ফকিহ্ ও আলেমগণ তাদের জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও সরকারের উপর নির্ভরশীল নন সেহেতু এই বৃহৎ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্তদের নিকট তারা অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও বিশেষ মর্যাদাশীল।

জাফরী শিয়াদের ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র গুলো –যেখান হতে ফকিহ্গণ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভ করেন– তাদের অর্থনৈতিক প্রয়োজন জনগণের স্বেচ্ছায় স্বতস্ফূর্তভাবে দেয়া খুমস ও জাকাতের টাকায় পূরণ করে থাকে এবং এ অর্থ দানকে (আলেমদের নিকট খুমস ও জাকাত অর্পণ) তারা নামাজ ও রোজার মতই ওয়াজিব ও শরয়ী বিধান বলে জানে।

জাফরী শিয়াগণ যে ব্যবসার লভ্যাংশ ও যেকোন উপার্জিত অর্থ হতে খরচের পর বিদ্যমান অবশিষ্টাংশের এক পঞ্চমাংশ (খোমস) দানকে ওয়াজিব মনে করে যার সপক্ষে সুস্পষ্ট দলিল রয়েছে। এরূপ কিছু দলিল সিহাহ্ সিত্তাহ ও সুনান গ্রন্থসমূহেও উদ্ধৃত হয়েছে। (এ জন্য শিয়া ফকিহদের লিখিত দলিল সমৃদ্ধ খুমস বিষয়ক গ্রন্থসমূহ দেখুন)

(৪০) জাফরী শিয়ারা বিশ্বাস করে মুসলমানদের অবশ্যই কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক পরিচালিত ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা থাকা উচিত যা মুসলমানদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার করবে, অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহের সাথে ন্যায়ভিত্তিক সুসম্পর্ক বজায় রাখবে, ইসলামের পবিত্র সীমার রক্ষক হবে, মুসলমানদের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করবে। এর ফলে মুসলমানরা সম্মানিত হবে ও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে যেমনটি পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছেঃ

ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين

"নিশ্চয়ই সম্মান হল আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও মুমিনদের জন্য।"[১]

মুমিনদের উদ্দেশ্যে অন্যত্র বলা হয়েছেঃ

وَ لا تَهِنُوا وَ لا تَحزَنُوا وَ أنتُم الاعلَونَ إن كُنتُم مُؤمِنِين

"আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। তোমরা অবশ্যই জয়ী হবে যদি তোমরা মুমিন হও।"[২]

১। সুরা মুনাফিকুন ৮।
২। সুরা আলে ইমরান ১৩৯।

শিয়ারা বিশ্বাস করে যেহেতু ইসলাম পূর্ণাঙ্গ দ্বীন সেহেতু সে রাষ্ট্র পরিচালনার সুক্ষতম পদ্ধতি ও রূপটি মানবতার জন্য উপস্থাপন করেছে। এজন্যই ইসলামী উম্মাহর আলেম ও চিন্তাবিদদের উচিত পূর্ণতম রাষ্ট্র পরিচালনা কাঠামোর ইসলামের উপস্থাপিত রূপটিকে উদ্ঘাটনে সমবেত ভাবে গবেষনায় লিপ্ত হওয়া ও তার দৃষ্টান্ত বিশ্ববাসীর কাছে উপস্থাপন করা। এর ফলে মুসলিম উম্মাহ তাদের অপরিসীম সমস্যা ও হত-বিহ্বল অবস্থা হতে মুক্তি পাবে। মহান আল্লাহ্ একমাত্র সহায় ও সাহায্যকারী।

إن تنصروا الله ينصركم و يثبت أقدامكم

"এবং তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য কর তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পদক্ষেপকে দৃঢ় রাখবেন।"

ধর্মীয় বিশ্বাস ও বিধিবিধানের ক্ষেত্রে এটিই ইমামী শিয়া বা জাফরী শিয়াদের অনুসৃত পথ।

এই মাজহাবের অনুসারীরা বিশ্বের সকল মুসলিম দেশে তাদের স্বধর্মী মুসলিম ভাইদের সাথে সহাবস্থান করছে। তারা মুসলমানদের সম্মান ও মর্যাদাকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখতে ও রক্ষায় আগ্রহী এবং এ পথে তাদের জীবন ও সম্পদ বিলিয়ে দিতে সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে।

সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহ্র জন্য।